POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কিছুর ইবাদত করিতেছ যাহা না তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারে, না কোন উপকার, এবং আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(আল মায়েদা: ৭৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 24

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 13 June, 2024 6 জুল হজ্জ1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

সুদ খাওয়ার নিন্দা এবং এর শাস্তি

২০৯৩) হযরত সাহার বিন সাআদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে: 'এক মহিলা 'বুরদা' নিয়ে আসে। তিনি বলেন, আপনারা জানেন বুরদা কি? তাঁকে বলা হয়, হ্যাঁ, ডোরাকাটা চাদর। সেই মহিলা বলল-'হে রসুলুল্লাহ্! আমি এটি নিজের হাতে বুনেছি আপনাকে পরানোর জন্য। নবী (সা.) সেটি গ্রহণ করেন। এটি তাঁর প্রয়োজন ছিল। এরপর তিনি আমাদের কাছে সেই চাদর পরিহিত অবস্থায় আসেন। লোকেদের মধ্যে একজন বলে উঠল হে রসুলুল্লাহ! আমাকে এই চাদরটি পরার জন্য দিন। তিনি (সা.) বললেন- বেশ। তিনি (সা.) কিছুক্ষণ মজলিসে বসে থাকলেন এরপর ভিতরে গিয়ে সেটিকে ভাঁজ করে সেই ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা তাকে বলল, তুমি তাঁর এই চাদরটি চেয়ে ভাল কাজ করলে না। তুমি তো জানই যে কেউ চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না। সেই ব্যক্তি বলল, খোদার কসম! আমি এটি এই কারণে চেয়েছি যাতে আমার মৃত্যুর পর এটি কাফন হয় । হযরত সাহাল (রা.) বলেন, সেই চাদরটিই তার কাফন হয়েছিল।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

আমন্ত্রিতদের সঙ্গে অনাহুত ব্যক্তি এসে পড়লে করণীয়

২০৮১) হযরত আবু মাসউদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন: এক আনসারী আসেন যার ডাকনাম ছিল আবু শোয়েব। সে তার ছেলে কাসাবকে বলল, খাবার তৈরী কর যা পাঁচ জনের জন্য পর্যাপ্ত হবে। কেননা আমি নবী (সা.)-কে আমন্ত্রিত করতে চাই। .... আমি তাঁর (সা.) চেহারা দেখে অনুভব করেছি যে তিনি ক্ষুধার্ত। সে (লোকেদের) আহ্বান করলে তাদের সঙ্গে আরও একজন ব্যক্তিও এসে পড়ে। নবী (সা.) বলেন, এই ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এসে পড়েছেন, তুমি চাইলে তাকে অনুমতি দাও আর যদি চাও সে ফিরে যাক তবে ফিরে যাবে। সে বলল, না, আমি তাকে অনুমতি দিলাম।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

সেই ব্যক্তি বড়ই বেঈমান যে কুরআনের প্রতি অনুরাগী হয় না এবং দিনরাত অন্যান্য পুস্তকের প্রতিই আসক্ত থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

যদি আমাদের নিকট কুরআন না থাকত আর কেবল হাদীসের সমষ্টিই আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসের মুকুটমণি হয়ে থাকত, তবে আমরা লজ্জায় অন্যান্য জাতির কাছে মুখ দেখাতে পারতাম না। আমি 'কুরআন' শব্দটির বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ করেছি। অতঃপর আমার নিকট উন্মোচিত হয়েছে যে, এই আশিসমণ্ডিত শব্দের মধ্যে একটি শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে। আর সেটি এই যে,এই কুরআনই অর্থাৎ পঠনযোগ্য পুস্তক আর একটা যুগে আরও বেশি পঠনযোগ্য পুস্তকের মর্যাদা লাভ করবে। যদিও আরও অন্যান্য পুস্তকও এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে। সেই সময় ইসলামের সম্মান রক্ষার জন্য এবং মিথ্যাকে সমূলে উৎপাটনের জন্য এই একটি পুস্তকই পঠনযোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং অন্যান্য পুস্তক সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে। 'ফুরকান' শব্দেরও এটাই অর্থ। অর্থাৎ এই পুস্তকটিই সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরুপণকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। কোন হাদীস বা অন্য কোন পুস্তক এই মূল্য ও মর্যাদা লাভ করবে না। (তিনি অত্যন্ত উদ্দীপনা ও গুরুত্বের সঙ্গে বলেন-) এখন সকল পুস্তক পরিহার কর এবং দিবারাত্র কিতাবুল্লাহ্‌ই পাঠ কর।সেই ব্যক্তি বড়ই বেঈমান যে কুরআনের প্রতি অনুরাগী হয় না এবং দিনরাত অন্যান্য পুস্তকের প্রতিই আসক্ত থাকে। আমাদের জামাতের উচিত একাগ্রতা ও অভিনিবেশ সহকারে কুরআন করীম পাঠে বিভোর হয়ে থাকা এবং নিজেদেরকে হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত নিমজ্জিত রাখা থেকে বিরত থাকা। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, কুরআন করীমের প্রতি সেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না বা সেভাবে পড়া হয় না যেভাবে হাদীসকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং পড়া হয়। এখন কুরআন করীমের অস্ত্র হাতে তুলে নাও, এতেই তোমাদের তোমাদের বিজয় নিহিত। এই জ্যোতির সামনে কোন অন্ধকার টিকতে পারবে না।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯)

মসজিদ মোমেনদের সমবেত হওয়ার এবং দোয়া ও যিকরে ইলাহির স্থান। এমন স্থান থেকে একজন প্রকৃত খোদা প্রেমী ও খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তি দূরে থাকতেই পারে না।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জ এর ২৭ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন-

যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত মসজিদও বায়তুল্লাহ্, কেননা সেগুলিও খোদার যিকরের জন্যই বিশেষভাবে নির্মিত হয়ে থাকে এবং বায়তুল্লাহ্‌র প্রতিরূপ হিসেবেই আল্লাহ্ তা'লা সেগুলিকে মর্যাদা দিয়েছেন। তাই এই আদেশ কেবল বায়তুল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট নয়। বরং প্রত্যেক মসজিদের জন্য আংশিকরূপে প্রজোয্য।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা গেলে জানা যায় যে, এই আয়াতে মসজিদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়ছে।

১) মসজিদ নির্মিত হয় যাতে পথিকগণ এর থেকে লাভবান হয়। ২) শহরের বাসিন্দারা লাভবান হয়। ৩) রুকু ও সিজদাকারীরা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গকারী এবং পরিপূর্ণ তৌহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা এর থেকে উপকৃত হয়।

মুসাফির বা পথিকরা এভাবে উপকৃত হতে পারে যে, যদি সে কোন আশ্রয় না পায় তবে সে কয়েক দিন থাকার অসুবিধা থেকে রক্ষা পেতে পারে। আর স্থানীয়রা এভাবে উপকৃত হতে পারে যে, মসজিদ হল হই-হুল্লোড় থেকে নিরাপদ একটি স্থান। এখানে মানুষ শান্তিতে নির্বিঘ্নে বসে দোয়া করতে পারে এবং নিজ প্রভুর কাছে মোনাজাত করতে পারে। আর যারা নিজেদেরকে খোদা তা'লার ধর্মের জন্য উৎসর্গিত করে, মসজিদই তাদের প্রকৃত ঠিকানা। কেননা মসজিদ মোমেনদের সমবেত হওয়ার এবং দোয়া ও যিকরে ইলাহির স্থান। এমন স্থান থেকে একজন প্রকৃত খোদা প্রেমী ও খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তি দূরে থাকতেই পারে না। কিন্তু এই বিষয়টিও দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, যিকরে ইলাহির পরিবর্ত হিসেবে সেই কাজও বিবেচিত হয় যেগুলির মাঝে সর্বসাধারণের কল্যাণ নিহিত থাকে- সেটা বিচার সম্পর্কিত হোক বা ঝগড়া-বিবাদ সম্পর্কিত হোক বা শিক্ষা সম্পর্কিত বা মুসলমানদের উন্নতি এবং অবনতি সম্পর্কি বিষয় হোক। যেমন রসুল করীম (সা.)-এর যুগে দেখতে পাই যে, ঝগড়া-বিবাদের বিচারও মসজিদে সম্পন্ন হত। অন্যান্য বিষয়ের বিচারও সেখানেই হত। শিক্ষাদানও চলত মসজিদেই। এর থেকে জানা যায় যে, মসজিদ কেবল আল্লাহ্‌র নাম যপের জন্য নয়, বরং সর্বসাধারণের প্রয়োজন সম্পর্কিত অন্যান্য কাজও মসজিদে করা যেতে পারে। কেননা,ইসলামে আল্লাহ্‌র মহিম কীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করাকেই যিকরে ইলাহি বলা হয় না, বরং বিধবাদের সেবা করাও ধর্ম। কেউ যদি কোন অনাথকে প্রতিপালন করে, তবে সেটাও ধর্ম। কেউ যদি ঝগড়া বিবাদের নিষ্পত্তি করে দেয় তবে সেটাও ধর্ম।

(তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মৌলিক ধর্মতত্ত্ব ও এর খুঁটিনাটি

হযরত আবু হানিফা সহ কতিপয় ফিকাহবিদ ঈদুল আযহিয়ার কুরবানীকে ওয়াজিব আখ্যায়িত করেরেছেন।

যে ব্যক্তি কুরবানী দেওয়ার সামর্থ রাখে তার জন্য সামর্থ অনুযায়ী কুরবানী দেওয়া ফরজ। আর যে ব্যক্তি কুরবানী দেওয়ার সামর্থ রাখে না,তার জন্য কুরবানী দেওয়া ফরজ নয়।

আঁ হযরত (সা.) মদিনায় দশ বছর ছিলেন আর এই দশ বছরে তিনি প্রতি বছর কুরবানী করেছেন।

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বে কুরবানী করে না সে যেন আমাদের নামাযের স্থানের নিকট না আসে।

প্রশ্ন: হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) একবার বলেছিলেন, 'কুরবানী করা কেবল তাদের জন্য অনিবার্য যারা হজ্জ করে।' কানাডা থেকে জনৈক আহমদী এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন যে, কোন ব্যক্তি যদি হজ্জে না যায় আর (পশু) কুরবানী করার সামর্থ রাখে, তবে কি তার জন্য কুরবানী করা ফরজ?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ৯ই জুলাই ২০২২ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

উত্তর: ঈদুল আজহিয়ার কুরবানীর বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে,আঁ হযরত (সা.) যথারীতি প্রতি বছর ঈদুল আজহিয়ার সময় কুরবানী করতেন-তিনি হজ্জে যান বা না যান আর মদীনাতেই অবস্থান করেন। আর অনেক সময় তিনি কুরবানরি পশু মদিনা থেকে মক্কায় কুরবানীর জন্য অন্য কারো সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যেমন হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল করীম (সা.) আমার পিতার সঙ্গে নিজের কুরবানীর পশু মক্কা প্রেরণ করেন। (বুখারী, কিতাবুল হজ্জ) অনুরূপভাবে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) মদিনায় দশ বছর ছিলেন আর এই দশ বছরে তিনি প্রতি বছর কুরবানী করেছেন। (সুনান তিরমিযি, কিতাবুল আযাহি) এছাড়া একাধিক পশু কুরবানী করারও হযরত রসুল করীম (সা.)-এর রীতি ছিল। যেমন হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) যখন কুরবানী করতে চাইতেন, তখন তিনি দুটি এমন ভেড়া কিনে আনতেন যেগুলি মাংসল এবং শিং যুক্ত হত এবং সেগুলি খাসি হত। এদের মধ্যে একটি তিনি নিজের উম্মতের পক্ষ থেকে এবং দ্বিতীয়টি নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে জবেহ করতেন। (সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আযাহি)।

অনুরূপভাবে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযুর (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বে কুরবানী করে না সে যেন আমাদের নামাযের স্থানের নিকট না আসে। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আযাহি,)

এছাড়াও হুযুর (সা.) হযরত আলী (রা.) কে এই ওসীয়ত করেছিলেন যে, তিনি যেন প্রত্যেক বছর হুযুর (সা.)-এর পক্ষ থেকে কুরবানী করেন। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আযাহি)

এই বর্ণনাগুলির প্রেক্ষিতে হযরত আবু হানিফা সহ কতিপয় ফিকাহবিদ ঈদুল আযহিয়ার কুরবানীকে ওয়াজিব আখ্যায়িত করেরেছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও সামর্থবান ব্যক্তির জন্য কুরবানী করাকে ফরজ আখ্যায়িত করেছেন। যেমন হযরত আকদস (আ.)-এর সমীপে এক ব্যক্তি নিবেদন করে যে, আমি কিছুটা অর্থ একটা কুরবানীতে অংশ গ্রহণের জন্য দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি আহমদী হওয়ার কারণে লোকেরা আমাকে কুরবানীর অংশ থেকে বের করে দেয়। আমি সেই অর্থ কাদিয়ানের মিসকীন ফান্ডে জমা করলে আমার কুরবানী হবে কি? হুযুর (আ.) বলেন, কুরবানীর পুণ্য তো কুরবানী করার ফলেই অর্জিত হয়। মিসকিন ফান্ডে অর্থ দিলে সেটা হতে পারে না। সেই অর্থ যদি যথেষ্ট হয় তবে তা দিয়ে একটি ছাগল কুরবানী দাও। আর যদি তা কম হয়, তার থেকে বেশি দেওয়ার যদি সামর্থ না থাকে, তবে তোমার জন্য কুরবানী করা ফরজ নয়। (বদর নম্বর, ৭, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:৮)

অতএব যে ব্যক্তি কুরবানী দেওয়ার সামর্থ রাখে তার জন্য সামর্থ অনুযায়ী কুরবানী দেওয়া ফরজ। আর যে ব্যক্তি কুরবানী দেওয়ার সামর্থ রাখে না,তার জন্য কুরবানী দেওয়া ফরজ নয়।

আর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) যে কথা বলেছেন, তার উত্তর হিসেবে বলব, যে ইউটিউব ক্লিপের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন, তার পুরো উত্তরটি আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনলে সমস্ত কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। হুযুর একথার উপর জোর দিচ্ছেন যে, যে-সব দেশে আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে, যাদের জন্য সারা বছরই খাবার পর্যাপ্ত পরিমানে মজুত থাকে, সেই সব দেশের মানুষরা যদি নিজেদের হাতে কুরবানী করলে বেশি পুণ্য পাওয়া যাবে- এমন চিন্তাভাবনা নিয়ে কুরবানী করে নেয় আর দারিদ্র পীড়িত দেশগুলিকে উপেক্ষা করা হয় তবে সেটা কুরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তবে তাবাররুক হিসেবে কিছু কুরবানী সেই সব দেশেও নিজেদের হাতে করা উচিত, কিন্তু বেশির ভাগ দারিদ্রপীড়িত দেশগুলিতে করে সেখানকার মানুষদের ঈদের আনন্দে অংশ গ্রহণ করার চেষ্টা করা কুরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্যর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কারণেই, একজন সামর্থবান ব্যক্তি যদি নিজের হাতে কুরবানী না করে কাউকে অর্থ দিয়ে তাকে কুরবানী করে দিতে বলে, ইসলামী দর্শনের আলোকে এই পদ্ধতি কতটা যুক্তিসঙ্গত? হুযুর (রাহে.) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, কুরবানীর যে প্রসঙ্গ, কুরবানী কেবল হাজীদের জন্য ফরজ, হজ্জের সময় পবিত্র ভূমিতে কুরবানী করা ফরজ। অন্যদের জন্য কুরআন করীম কোথাও কুরবানী করাকে ফরজ ঘোষণা করে নি। এই কারণে তারা হজ্জের সমর্থনে পুণ্যার্জনের জন্য এমনটি করে আর পুণ্য অর্জনের জন্য পুণ্যের অর্থকেও দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। একদিকে যেখানে দারিদ্র পীড়িত মুসলমানেরা অনাহারে মারা যাচ্ছে বা আফ্রিকার দেশের মানুষেরা অনাহার যাপন করছে, সেই সব দেশে কুরবানী না করিয়ে যে সমাজের মানুষ এমনিতেই অতিরিক্ত মাংস ভক্ষন করে আর যে সব দেশে ম্যাড কাউ ডিজিজ -এর প্রসার ঘটছে সেখানে পুণ্য লাভের আশায় নিজের হাতে ছুরি চালনা করে কুরবানী দেওয়া কতটা যুক্তি সঙ্গত হতে পারে? এতে পুণ্য লাভ হবে না কি শাস্তি লাভ হবে? তাবাররুক হিসেবে কিছু কুরবানী যদি মানুষ শখ করে করে এখানেও করে দেয়, তবে আমি তার বিরুদ্ধে বলছি না।কিন্তু এমন সব দেশে মুসলমানদের জন্য নিজেদের দরিদ্র দেশগুলিতে নিজেদের সেই সব ভাইদের জন্য কুরবানী দেওয়া শ্রেয়, যাদের ভাগ্যে বছরে এই একমাত্র কুরবানীর দিনটি ছাড়া একবারও মাংস জোটে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, করআন করীমের আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার নিকট তাদের কুরবানীর মাংস বা রক্ত কিছুই পৌঁছয় না। তাঁর নিকট যেটা পৌঁছয় সেটা হল তোমাদের অন্তরের তাকওয়া। অতএব আপনারা যদি তাকওয়ার সাথে অন্যান্য দেশে কুরবানী করান তবে তাকওয়া অবশ্যই খোদা তা'লার নিকট পৌঁছে যাবে। তাকওয়ার প্রতিদান পাওয়া যাবে, মাংসের প্রতিদান নয়।

প্রশ্ন: একজন বন্ধু হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর একটি জুমুআর খুতবায় বর্ণিত পবিত্র জুমআর দিন দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ একটি মুহূর্ত সম্পর্কে হুযুরের বক্তব্য, একইভাবে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার শেষ দিনের বক্তব্যে তারাবীর নামাযে পুরো এক পারা (কুরআন) পড়ার পরিবর্তে ছোট ছোট সূরা পাঠ করা সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বক্তব্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের পত্রে উপর্যুক্ত দুটি বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আমি আমার জুমুআর খুতবায় জুমুআর দিনে আগত দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্ত সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে বর্ণনা করেছিলাম যে, এটি খুবই সংক্ষিপ্ত একটি মুহূর্ত। আর দ্বিতীয়ত এর জন্য বিভিন্ন সময় বর্ণিত হয়েছে। হাদীস বিশারদগণ এবং ফিকাহ্বিদগণও এই মুহূর্তের সময় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিভিন্ন সময় বর্ণনা করেছেন।

আমার মতে এই মুহূর্তটির জন্য বিভিন্ন সময় বর্ণনা করার পেছনের প্রজ্ঞাটি হল, জুমুআর পুরো দিনটিই অত্যন্ত আশিসপূর্ণ, এজন্য (শুক্রবার) সারাদিনই মানুষের দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করা উচিত। নামায সংক্ষিপ্ত করার যে বিষয়, এক্ষেত্রে আপনি আমার দুটি বক্তব্যের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছেন। হাদীসের আলোকে আমি একটি কথা বলেছিলাম যে, মহানবী (সা.)-এর সমীপে কেউ একজন ইমামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, যিনি অনেক দীর্ঘ নামায পড়াতেন। আর এক্ষেত্রে মহানবী (সা.) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

এছাড়া আমি একথাও বলেছিলাম, নামায সংক্ষিপ্ত করার অর্থ এটি নয় যে, তাড়াতাড়ি (মুরগির মতো)

(এরপর ৯ পাতার পর.....)

জুমআর খুতবা

মানবজীবনের প্রতি সম্মানের কারণেই তিনি, শত্রুগোত্রীয় লোকদের প্রাণ রক্ষার্থে এ কৌশল অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ গণমানুষের প্রাণ রাক্ষাকে একজনকে হত্যা করা শ্রেয় । এটি মানবতার প্রতি সহানুভূতির পরম মার্গ। বর্তমান কালের তথাকথিত সভ্য বিশ্ব কিছু লোককে হত্যার অজুহাতে নিষ্পাপ শিশু-নারী-বৃদ্ধদের হত্যা করছে আর নির্লজ্জতার সাথে বলছে, যুদ্ধে তো এরূপ হয়েই থাকে। মহানবী (সা.) যথারীতি যুদ্ধের সময়ও এ আদেশ দিতেন যে, কোন শিশু-বৃদ্ধ-নারী এবং ধর্মীয় পণ্ডিত-পুরোহিত যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না তাদেরকে হত্যা করবে না।

মহানবী (সা.) নিজ হাতের লাঠি আব্দুল্লাহ্‌কে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন এবং বলেন, এই লাঠি জান্নাতে তোমার ভর দেওয়ার কাজে আসবে। আব্দুল্লাহ্ (রা.) এই বরকতময় লাঠি অতি সাদরে ও আন্তরিকতার সাথে নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন আর মৃত্যুকালে ওসিয়্যত করেন যে, এটিকে তাঁর সাথেই যেন দাফন করা হয়। অতএব উক্ত ওসিয়্যত বাস্তবায়ন করা হয়। আব্দুল্লাহ্ (রা.)-এর সফল প্রত্যাবর্তনে মহানবী (সা.) পরম আনন্দিত ছিলেন যার বহিঃপ্রকাশস্বরূপ তিনি (সা.) তাকে অসাধারণ পুরস্কারে ভূষিত করেন। যা থেকে বুঝা যায় যে, সুফিয়ান বিন খালেদের নৈরাজ্যকে মহানবী (সা.) চরম বিপজ্জনক জ্ঞান করতেন এবং তার মৃত্যুকে সার্বজনীন নিরাপত্তার জন্য রহমতের কারণ মনে করতেন। ”

হে আমার জাতির লোকেরা! এটি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমরা কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হই নি।

আজকে আমি পুনরায় ইয়েমেনের কারাবন্দিদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। পাকিস্তানের কারাবন্দিদের মুক্তির জন্যও দোয়া করুন। ফিলিস্তিনের লোকদের জন্যও দোয়া অব্যাহত রাখুন। সেখানে পরিস্থিতি ভাল হতে হতে আবার খারাপের দিকে চলে যায়। ইসরাঈলি সরকার নির্লজ্জভাবে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে (ফিলিস্তিনবাসী) তাদের অত্যাচারনিপীড়নের হাত থেকে অতিশীঘ্রই মুক্তি দান করুন এবং মুসলমানদেরকেও নিজেদের দায়িত্ব (যথাযথভাবে) পালন করার তৌফিক দান করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১০ মে, , ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (১০ হিজরত, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ মহানবী (সা.)-এর যুগের কতিপয় সারিয়া তথা সেনা অভিযানের উল্লেখ করব। এ সম্পর্কে প্রথমেই বনু আসাদ গোত্রের দুষ্কৃতি এবং আবু সালামার সেনা অভিযানের কথা উল্লেখ করা হবে। সারিয়া বলা হয় সেই সেনা অভিযানকে যাতে মহানবী (সা.) নিজে অংশগ্রহণ করতেন না, কিন্তু তিনি (সা.) অন্যদের অভিযানে প্রেরণ করতেন। এগুলোতেও তাঁর (সা.) সীরত বা জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত হয়। তাঁর (সা.) প্রজ্ঞা ও তিনি কীভাবে মুসলমানদের সুরক্ষা করতেন আর শত্রুদের জন্যও তিনি কিভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করতেন; এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি তথা তাঁর জীবনীর এ দিকগুলোর ওপর সেসব সেনাঅভিযানের মাধ্যমে আলোকপাত হয়।এই সেনাঅভিযান চতুর্থ হিজরী সনের মহররম মাসে পরিচালিত হয়। এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমি।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪২৪)

আবু সালামার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ এবং উপনাম ছিল আবু সালামা। তার মায়ের নাম ছিল বাররাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালেব। তিনি মহানবী (সা.)-এর ফুপাতো ভাই এবং হযরত হামযা (রা.)-এর দুধভাইও ছিলেন।তিনি আবু লাহাবের দাসী সোয়াইবার দুধ পান করেছিলেন। হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামার বিয়ে পূর্বে তার সাথেই হয়েছিল।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৫)

হযরত আবু সালামা বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। এক মাস পর্যন্ত সেই ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করান। বাহ্যত সে ক্ষত সেরে ওঠেছিল আর তা এমনভাবে সেরে ওঠেছিল যে, কোন ক্ষত আছে কিনা তা বোঝাই যেতো না।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮২)

এ অভিযানের পটভূমি কিছুটা এরূপ যে, 'মদিনায় বসবাসরত মুনাফেক ও ইহুদিরা উহুদের যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা ও ঘটনাবলীর কারণে আনন্দ উদযাপন আরম্ভ করে আর পুনরায় তাদের হৃদয়ে এই ধারণার উদয় হতে থাকে যে, মুসলমানদের দ্রুত ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পনা করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে মদিনার আশেপাশে বসবাসকারী যেসব গোত্র বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের মহান বিজয়ের কারণে ভীত হয়ে পড়েছিল, তাদের মনেও এ ধারণা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাই মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তাদের ক্ষয়ক্ষতি সাধন আর লুটতরাজ করে তাদের ধন-সম্পদ দখল করার এখনই সুযোগ । অতএব উহুদের যুদ্ধের কেবল দুই মাস অতিক্রান্ত হতেই সেসব গোত্র থেকে যে গোত্রটি সর্বপ্রথম মুসলমানদের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল সেটি ছিল বনু আসাদ বিন খুযায়মা। তারা নাজাদ-এর অধিবাসী ছিল। এ গোত্রের নেতা তুলায়হা বিন খুয়ায়লেদ ও তার ভাই সালামা বিন খুয়ায়লেদ লোকদের একত্রিত করে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে ফেলে।

বনু আসাদ-এর একজন ব্যক্তি কায়েস বিন হারেস বিন উমায়ের নিজ জাতির লোকদের মুসলমানদের ওপর আক্রমণ না করার পরামর্শ প্রদান করে বলে, হে আমার জাতির লোকেরা! এটি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমরা কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হই নি।

মুসলমানরা আমাদের কোনো ক্ষতি করছে না। আর তারা আমাদের ওপর লুটতরাজের উদ্দেশ্যে আক্রমণও করে নি। আমাদের অঞ্চল ইয়াসরেব

অর্থাৎ মদিনা থেকে দূরে (অবস্থিত)। কুরাইশদের ন্যায় সেনাবাহিনীও আমাদের নেই। স্বয়ং কুরাইশরা এক দীর্ঘকাল থেকে আরবদের নিকট তাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে আসছে। তারা তো তাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) বিরুদ্ধে প্রতিশোধও নিতে চাইছিল। এরপর তারা উটে আরোহন করে ঘোড়ার লাগাম সামলে বের হয়েছিল। তারা তিন হাজার যোদ্ধা এবং নিজেদের অনুসারীদের একটি বড় সংখ্যা সাথে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক অস্ত্রশস্ত্রও (সাথে) নিয়েছিল। এর বিপরীতে তোমাদের ক্ষমতাই বা কতটুকু। তোমারা সর্বোচ্চ তিনশো ব্যক্তিকে নিয়ে বের হবে। এভাবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের ধোঁকায় নিপতিত করবে, নিজেদের এলাকা থেকে দূরে চলে যাবে। আর আমার ভয় হলো তোমরা বিপদে নিপতিত হবে। কিন্তু তারা কায়েসের পরামর্শ শোনে নি। অপরদিকে বনু আসাদ গোত্রের মদিনা মুনাওয়ারার ওপর আক্রমণ করার পরিকল্পনার সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে এভাবে পৌঁছে যায় যে, ত্যায় গোত্রের এক ব্যক্তি ওয়ালীদ বিন যুহায়েরমদিনায় আসে। সে তার ভাতিজী যয়নবের সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছিল যে কিনা তুলায়েব বিন উমায়ের বিন ওহাব-এর স্ত্রী ছিল। সে বনু আসাদ গোত্রের উপরোল্লিখিত পরিকল্পনার সংবাদ প্রদান করলে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, বনু আসাদ গোত্র মদিনায় আক্রমণ করার পূর্বেই স্বয়ং মুসলমানরা নিজেদের সুরক্ষার্থে তাদের এলাকায় আক্রমণ করুক।অতএব তিনি (সা.) হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদকে ডেকে পাঠান আর তাকে নির্দেশ দেন যে, এই অভিযানে রওয়ানা হয়ে যাও। আমি তোমাকে এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছি। এরপর তিনি (সা.) তার জন্য পতাকা বাঁধেন। আর এই নির্দেশনা দেন যে, বনু আসাদ-এর এলাকা পর্যন্ত তোমাদের সফর অব্যহত রাখো, তাদের বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার পূর্বেই সেখানে পৌঁছে তাদের ওপর আক্রমণ করো। ১৫০জন সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী আবু সালামার নেতৃত্বে এসব গোত্রকে দমন করার জন্য রওয়ানা হয়। ত্যায় গোত্রের সেই ব্যক্তি, অর্থাৎ ওয়ালীদ বিন যুহায়ের গাইড বা পথপ্রদর্শক হিসেবে তাদের সাথে ছিল।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪২২-৪২৫) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৪)

এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী কতিপয় সাহাবীর নাম হলো- আবু সাবরা বিন আবি রুহম, আব্দুল্লাহ্ বিন সুহায়েল বিন আমর, আব্দুল্লাহ্ বিন মাকরামা আমরী, মুআত্তেব বিন ফযল, আরকাম বিন আবি আরকাম, আবু উবায়দা বিন জাররাহ, সুহায়েল বিন বায়যা, উসায়েদ বিন হুযায়ের আনসারী, আব্বাদ বিন বিশর আনসারী, আবু নায়েলা আনসারী, আবু আবস কাতাদা বিন নোমান, নযর বিন হারেস, আবু কাতাদা আনসারী, আবু আইয়াশ যুরাকী, আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারী, খুবায়েব বিন ইয়াসাফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, আবু হুযায়ফা বিন উতবা, আবু হুযায়ফার ক্রীতদাস সালেম।

(কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪১)

সাহবীরা নিজেদের এই অভিযান গোপন রেখে দ্রুতবেগে সাধারণ পথ থেকে সরে গিয়ে অগ্রসর হন যাতে দ্রুততর সময়ে শত্রুদের কাছে পৌঁছে যান। তারা রাতদিন অনবরত এই সফর করেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে দিনের একটি অংশ তারা লুকিয়ে থাকতেন আর রাতে সফর করতেন। এভাবে চারদিন সফরের পর তারা কাতান পাহাড়ের নিকটে পৌঁছে যান। কাতান সম্পর্কে লেখা আছে যে, এটি ফ্যেদ-এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। আর ফ্যেদ কুফার পথে একটি বিরতিস্থলের নাম যেখানে বনু আসাদ বিন খুযায়মা-র ঝরনা ছিল। মুসলমানরা সেখানে পৌঁছতেই আক্রমণ করে তাদের গবাদিপশু দখল করে নেয়। তাদের রাখালদের মধ্য থেকে তিনজনকে বন্দি করে আর বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই পলায়নকারীরা বনু আসাদ-এর বসতিস্থালে পৌঁছে মুসলমান বাহিনীর আগমন এবং তাদের আক্রমণের সংবাদ দেয় আর আবু সালামার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা অনেক বাড়িয়ে বলে। অর্থাৎ এই রাখালরাও অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেয় যে, অনেক বড় বাহিনী এসেছে। যার ফলে তাদের মাঝে আরও ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। বনু আসাদ গোত্র ভীত-ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আর মুসলমানদের হঠাৎ পৌঁছে যাওয়ার কারণে এমন ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে যে, তারা ভয়ে এদিক-সেদিক পালিয়ে যায়। হযরত আবু সালামা যখন বনু আসাদ গোত্রের শিবিরে পৌঁছেন আর দেখেন যে, শত্রুরা পালিয়ে গেছে তখন তিনি তাদের সন্ধানে নিজ সঙ্গীদের প্রেরণ করেন। হযরত আবু সালামা তাদেরকে তিনটি অংশে বিভক্ত করেন। একটি অংশ তার সাথে অবস্থান করে। অপর দুই অংশকে তিনি দুটি ভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন। আর একইসাথে এই নির্দেশনাও প্রদান করেন যে, শত্রুদের পিছু ধাওয়ায় বেশি দূরে যাবে না। আর যদি শত্রুদের সাথে সংঘর্ষ না হয় তাহলে ফিরে এসে তারা যেন রাতে তার কাছেই অবস্থান করে। আর এই জোরালো নির্দেশও দেন যে, বিক্ষিপ্ত হবে না, একসাথে থাকবে। কিন্তু শত্রুরা হতবিহ্বল হয়ে এত দ্রুত পলায়ন করেছিল যে, কারো সাথেই মুসলমানদের মোকাবিলা হয় নি। হযরত আবু সালামা সমস্ত গনিমতের মালসহ মদিনার ফিরতি সফরআরম্ভ করেন। যে ব্যক্তি পথপ্রদর্শক হিসেবে সাথে গিয়েছিল সে তাদের সাথেই ফিরে আসে। এক রাতের সফর করার পর হযরত আবু সালামা গনিমতের সম্পদ ভাগ করেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর জন্য খোমস তথা এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে রাখেন। পথ-প্রদর্শককে তার পছন্দ অনুসারে সম্পদ দান করেন আর অবশিষ্ট মালে গণিমত সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করে দেন। প্রত্যেক সাহাবীর ভাগে সাতটি উট এবং বেশ কয়েকটি ছাগল আসে। আর এভাবেই তারা তাদের অবশিষ্ট পথ পাড়ি দিয়ে প্রায় দশ দিন পরে উৎফুল্ল ও আনন্দিত মদীনায় পৌঁছান। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৪)

হযরত আবু সালামা (রা.)-র মৃত্যু সম্পর্কে লেখা আছে, হযরত আবু সালমা (রা.)-র বরাতে আমি যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তা বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকের)ও কিয়দাংশ এতে অন্তর্ভুক্ত আছে। যাহোক, হযরত আবু সালামা (রা.)-র মৃত্যু সম্পর্কে লেখা আছে, হযরত আবু সালমা (রা.) এই সারিয়্যার বা সেনাভিযানের জন্য দশ রাতের চেয়ে কিছু অধিক সময় মদীনার বাইরে ছিলেন। মদীনায় ফিরে আসার পর তিনি উহুদের যুদ্ধে যে আঘাত পেয়েছিলেন তাতে ইনফেকশান দেখা দেয়, যে কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর সেই বছরই ৩রা জমাদিউল আখেরে তিনি পরলোক গমন করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮২)

বনু আসাদের নেতা তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদের উল্লেখ করা হয়েছে, সে অত্যন্ত সাহসী মানুষ ছিল। প্রসিদ্ধ আছে আরবদেশে তাকে এক হাজার অভিজ্ঞ অশ্বারোহীর সমান মনে করা হতো। আর সে খুবই বাগ্মী ছিল। নবম হিজরীতে বনু আসাদের (একটি) প্রতিনিধি-দলের সাথে সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই মিথ্যা নবুয়্যতের দাবী করে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলার কারণ হয়, আর পরিশেষে পরাজিত হয়ে আরব থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। পুনরায় কিছুকাল পরে মদীনায় এসে হযরত উমর (রা.)-র হাতে বয়আত করে এবং আমৃত্যু পর্যন্ত ইসলামে অবিচল থাকেন। কাদসিয়ার যুদ্ধ এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি ইসলামি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নিজের বীরত্বের স্বাক্ষর রাখে এবং ২১ হিজরীতে একটি যুদ্ধে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ৪৩০-৪৩১)

আল্লাহ্ তা'লা তার পরিণতি শুভ করতে চেয়েছেন, তাই অবশেষে সে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করে। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস সেনা অভিযানের উল্লেখ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস জুহনী (রা.) আনসারের মধ্য হতে বনু সালামার মিত্র ছিলেন। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আত, বদর, উহুদ সহ অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (তিনি) সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা বনু সালামার প্রতিমা ভেঙ্গেছিলেন।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৮) (আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪১২)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.) ৫৪ হিজরীতে অথবা কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে ৭৪ হিজরীতে সিরিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।

(আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৮)

উহুদের যুদ্ধের ঘটনাবলী যখন মদীনার আশেপাশের গোত্রের লোকেরা যখন জানতে পারে তখন যারা মুসলমানদের দুর্বল মনে করে তাদের ওপর আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করছিল তাদের মধ্যে বনু লাহইয়ান গোত্রের নেতা খালিদ বিন সুফিয়ান হুযলী লাহিয়ানীও ছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে তার নাম সুফিয়ান বিন খালিদও উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, সে মনে করল, সদ্য উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাই তাদের এই দুর্বলতার সুযোগে তাদের ওপর আক্রমণ রচনা করে আর মদীনায় লুটপাট চালিয়ে তাদের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব বলয় বিস্তৃত করা উচিত? তার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভয়াবহ শত্রুতা ছিল আর (সে) চরম অহংকারী ছিল। সে নাখলা অথবা আরাফাতের নিকটবর্তী উরনা উপত্যকায় সেনাদল প্রস্তুত করছিল। সে তার গোত্রের যুদ্ধবাজ ও আশেপাশের লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমবেত করার অভিযান পরিচালনা করছিল আর ইতিমধ্যে বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক মানুষ তার সাথে জড়োও হয়ে গিয়েছিল। (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ৪৩৩)

মহানবী (সা.) যখন জানতে পারেন যে, সুফিয়ান বিন খালিদ মদীনায় আক্রমণ করার জন্য এক সেনাদল সমবেত করেছে, তখন তিনি (সা.) একটি অনন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ সামরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, অর্থাৎ সেনাদল গঠন করে সুফিয়ানের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করলে উভয় পক্ষের রক্তপাত ঘটবে; তাই প্রজ্ঞার সাথে এই বিদ্রোহী সেনাদল গঠনের মূল হোতাকে হত্যা করাই বাঞ্ছনীয়। অতএব, মহানবী (সা.) এই বিপজ্জনক অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজের

জন্য নিজের একজন সাহসী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েসকে বেছে নেন। (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ৪৩৩-৪৩৪)

মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.)-কে ডেকে সুফিয়ান বিন খালিদের সকল ষড়যন্ত্রের কথা খুলে বলেন এবং বলেন, 'চুপিসারে গিয়ে তাকে হত্যা করো'।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) , ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৩৫]

আব্দুল্লাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তার অবয়ব সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি (সা.) বলেন, তাকে দেখতেই তুমি পেয়ে যাবে আর তাকে দেখলেই শয়তানের কথা মনে পড়বে। আব্দুল্লাহ্ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি কখনো কাউকে ভয় করি নি। তিনি (সা.) বলেন, সত্য বলেছ, কিন্তু তাকে দেখে তোমার (শরীরের) লোম দাঁড়িয়ে যাবে। অতএব, তিনি একাই ৪র্থ হিজরীর ৫ই মহররম তারিখে এই অভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমি যখন আরাফতের নিকটবর্তী উপত্যকা উরানায় পৌঁছি তখন আমি সুফিয়ানকে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে দেখি আর তার পেছনে বিভিন্ন গোত্রের ঐসব লোকেরা ছিল যারা তার সাথে যোগ দিয়েছিল। [সে বার্ধক্যের কারণে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটছিল না বরং সেই যুগের রীতি অনুযায়ী হাতে লাঠি রাখতো। যাহোক,] আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তার সেসব লক্ষণ বর্ণনা করেছিলেন তা দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারি। কেননা, তাকে দেখামাত্রই আমার ওপর ভীতি ছেয়ে যায়, যদিও আমি কখনো কাউকে ভয় পেতাম না। কাজেই, আমি মনে মনে বলি, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (সা.) সত্য বলে ছিলেন। তখন সময়টি ছিল আসর নামাযের। আমার আশঙ্কা হয়, এখনই যদি আমি তার মুখোমুখি হই তাহলে আবার আমার আসরের নামায না ছুটে যায়! তাই আমি তার উদ্দেশ্যে হাঁটতে হাঁটতে ইশারায় নামায পড়ে নিই। আমি তার কাছে পৌঁছলে সে জিজ্ঞেস করে তুমি কে? আমি উত্তরে বলি আমি বনু খুযআ গোত্রের সদস্য। আমি শুনেছি, তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর মোকাবিলা করার জন্য সৈন্য-সংগ্রহ করছ, আমিও তোমার সাথে যোগ দিতে এসেছি। সে বলে, (হ্যাঁ) নিঃসন্দেহে আমি মুহাম্মদকে মোকাবিলা করার জন্য সেনা-সংগ্রহ করছি। অতএব, আমি কিছুক্ষণ তার সাথে হাঁটতে থাকি এরপর আমি তার সাথে কথা বলতে আরম্ভ করলে সে আমার কথায় গভীর আগ্রহ দেখায়। সুফিয়ান বিন খালিদ বলে, আসলে এখন পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা.) আমার মতো কারও মুখোমুখী হয় নি! এখন পর্যন্ত কেবল এমন লোকদের সাথেই (তাঁর) যুদ্ধ হয়েছে যারা রণে অনভিজ্ঞ। অবশেষে সে যখন তার তাঁবুতে পৌঁছে এবং তার সঙ্গীরা চলে যায় তখন সে আমাকে বলে, হে খুযায়ী ভাই! একটু এদিকে আসো। আমি তার কাছে গেলে সে বলে, বসো; আমি তার কাছেই বসে পড়ি। যখন রাতের নিস্তব্ধতা ছেয়ে যায় এবং লোকজন ঘুমিয়ে পড়ে তখন আমি অকস্মাৎ উঠে তাকে হত্যা করে তার মস্তক হাতে নিই। আমি সেখান থেকে বের হয়ে নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিই। কিছু লোক খুঁজতে খুঁজতে সেই গুহা পর্যন্ত আসলেও তারা কিছুই (খুঁজে) না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যায়। এরপর আমি গুহা থেকে বের হয়ে রওয়ানা হই। আমি রাতের বেলা সফর করতাম (আর) দিনে কোথাও লুকিয়ে থাকতাম, অবশেষে মদীনায় পৌঁছলে আমাকে দেখামাত্রই মহানবী (সা.) অবলীলায় বলেন, 'আফলাহাল ওয়াজহু' অর্থাৎ, এই চেহারা সফল হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখুন! তিনি তৎক্ষণাৎ পরম বুদ্ধিমত্তা ও বিনয়ের সাথে মহানবী (সা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, اَفْلَحَ وَجْهُكَ يَارَسُوْلَ الله অর্থাৎ, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার চেহারা সফল হয়েছে। অর্থাৎ এসব সফলতা আপনারই, আপনার দোয়ার কল্যাণেই (একাজ সম্ভব) হয়েছে। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) পুরো ঘটনা বর্ণনা করে সেই বিদ্রোহী নেতার (কর্তিত) মস্তক মহানবী (সা.)-এর সামনে রাখেন।(এ সম্পর্কে) একটি রেওয়াতে এমনও আছে যে, হযরত আব্দু ল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.)-র ফিরে আসার পূর্বেই মহানবী (সা.) সুফিয়ান বিন খালিদের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, এই সফলতায় আনন্দিত হয়ে তিনি (সা.) আমাকে একটি লাঠি উপহার দিয়ে বলেন, 'জান্নাতে এটি আমার ও তোমার মাঝে (একটি স্মারক) চিহ্ন হবে। তুমি জান্নাতে এর (লাঠির) সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াবে। অতএব, এরপর থেকে আমৃত্যু সেই লাঠিটি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.)-র কাছেই ছিল। এমনকি তিনি যখন অন্তিম শয্যায় তখন তিনি নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে এ সম্পর্কেওসিয়্যত করে বলেন, এই লাঠি আমার কাফনের মধ্যে এমনভাবে রাখবে যেন তা আমার শরীর ও কাফনের মাঝে থাকে। অতএব পরিবারের সদস্যরা তাঁর নির্দেশ অনুসারে কাজ করে। আব্দুল্লাহ বিন উনায়েসকে যুল-মিখসারা তথা লাঠি ওয়ালাও বলা হয়। (সীরাতুল হালবিয়া,৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩১-২৩২)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উনায়েস ১৮দিন মদীনার বাইরে অবস্থান করেন আর মুহাররমের ০৭দিন বাকি থাকতে শনিবার (মদীনায়) প্রত্যাবর্তন করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯)

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব এম.এ. (রা.) ০৪হিজরীর মুহাররমে সংঘটিত এই অভিযানের বিস্তারিত উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন: "কুরায়েশের উসকানি এবং উহুদে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় খুব দ্রুত বিপজ্জনক ফলাফল প্রকাশ করছিল। যেমন সেদিনগুলোতে বনু আসাদ মদীনায় চোরাগুপ্তা আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) জানতে পারলেন, বনু লেহিয়ান গোত্রের লোকেরা তাদের নেতা সুফিয়ান বিন খালেদের উস্কানিতে তাদের মাতৃভূমি 'উরআনাহ'য় বৃহৎ সেনাসমাবেশ করছে যেটি মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থান ছিল আর তারা মদীনার ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত। মহানবী (সা.) ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং আরবের ভিভিন্ন গোত্রের অবস্থা এবং তাদের নেতাদের শক্তিমত্তা ও প্রভাবের বিষয়ে ভালোভাবে অবগত ছিলেন; এই সংবাদ শোনামাত্র বুঝতে পেরেছেন যে, এই সকল দুস্কৃতি ও নৈরাজ্য সৃষ্টির হোতা বনু লেহিয়ানের নেতা সুফিয়ান বিন খালেদ। সে না থাকলে বনু লহিয়ান মদীনায় আক্রমণ করার সাহস করবে না। তিনি (সা.) এটিও জানতেন যে, সুফিয়ান ছাড়া এই গোত্রে বর্তমানে এ ধরনের দুস্কৃতিমূলক কর্মে নেতৃত্ব দিতে পারে- এমন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি নেই। অতএব বনু লেহিয়ানের বিরুদ্ধে কোনো সেনাদল পাঠালে দুর্বল মুসলমানদের জন্য কষ্টের কারণ তো হবেই উপরন্তু এতে আরো অধিক রক্তপাতের কারণ হতে পারে- একথা ভেবে তিনি (সা.) সিদ্ধান্ত দিলেন যে, কোনো এক ব্যক্তি সেখানে গিয়ে সুযোগ বুঝে এই নৈরাজ্যের হোতা এবং দুস্কৃতির জন্য দায়ী সুফিয়ান বিন খালেদকে হত্যা করা উচিত। অতএব এ উদ্দেশ্যে তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ বিন উনায়েস আল-জুহানী আনসারীকে প্রেরণ করেন। যেহেতু আব্দুল্লাহ্ (রা.) পূর্বে কখনো সুফিয়ানকে দেখেন নি তাই তিনি (সা.) স্বয়ং তাকে সুফিয়ানের পূর্ণ অবয়ব ইত্যাদি বিষয়ে অবগত করেন এবং শেষে বলেন, সাবধান থাকবে কেননা সুফিয়ান এক মূর্তিমান শয়তান। অতএব আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস খুব সাবধানতার সাথে বনু লেহিয়ানের শিবিরে পৌঁছে দেখেন সত্যিই তারা পূর্ণ উদ্যমে মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। এই রাতের আধারেইসুযোগ বুঝে তিনি (রা.) সুফিয়ানের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। বনু লেহিয়ান এই সংবাদ জানতেই আব্দুল্লাহ্ (রা.) -এর পিছু ধাওয়া করে কিন্তু তিনি (রা.) লুকিয়ে প্রাণে বেঁচে ফেরেন। আব্দুল্লাহ বিন উনায়েস মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) তার চেহারা দেখেই বুঝে যান যে, তিনি কার্যসিদ্ধি করে এসেছেন। অতএব তাকে দেখে তিনি (সা.) বলে ওঠেন, 'আফলাহাল ওয়াজহু' এই চেহারায় তো সফলতার প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। প্রত্যুত্তরে আব্দুল্লাহ্ (রা.) নিবেদন করেন এবং অতি প্রশংসনীয় বাক্যে বলেন যে, 'আফলাহা ওয়াজহুকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' অর্থাৎ হে আল্লাহ্র রসূল! সকল সফলতা আপনার-ই। তখন মহানবী (সা.) নিজ হাতের লাঠি আব্দুল্লাহ্কে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন এবং বলেন, এই লাঠি জান্নাতে তোমার ভর দেওয়ার কাজে আসবে। আব্দুল্লাহ্ (রা.) এই বরকতময় লাঠি অতি সাদরে ও আন্তরিকতার সাথে নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন আর মৃত্যুকালে ওসিয়্যত করেন যে, এটিকে তাঁর সাথেই যেন দাফন করা হয়। অতএব উক্ত ওসিয়্যত বাস্তবায়ন করা হয়। আব্দুল্লাহ্ (রা.)-এর সফল প্রত্যাবর্তনে মহানবী (সা.) পরম আনন্দিত ছিলেন যার বহিঃপ্রকাশস্বরূপ তিনি (সা.) তাকে অসাধারণ পুরস্কারে ভূষিত করেন। যা থেকে বুঝা যায় যে, সুফিয়ান বিন খালেদের নৈরাজ্যকে মহানবী (সা.) চরম বিপজ্জনক জ্ঞান করতেন এবং তার মৃত্যুকে সার্বজনীন নিরাপত্তার জন্য রহমতের কারণ মনে করতেন। "

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৫১২-৫১৩)

ইসলামের বিরোধী শত্রুরা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলে, নাউযুবিল্লাহ্ তিনি (সা.) নাকি শান্তি বিনষ্ট করেছেন এবং মানুষ খুন করিয়েছেন। অথচ মানবজীবনের প্রতি সম্মানের কারণেই তিনি, শত্রুগোত্রীয় লোকদের প্রাণ রক্ষার্থে এ কৌশল অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ গণমানুষের প্রাণ রাক্ষাকে একজনকে হত্যা করা শ্রেয় । এটি মানবতার প্রতি সহানুভূতির পরম মার্গ। বর্তমান কালের তথাকথিত সভ্য বিশ্ব কিছু লোককে হত্যার অজুহাতে নিষ্পাপ শিশু-নারী-বৃদ্ধদের হত্যা করছে আর নির্লজ্জতার সাথে বলছে, যুদ্ধে তো এরূপ হয়েই থাকে। মহানবী (সা.) যথারীতি যুদ্ধের সময়ও এ আদেশ দিতেন যে, কোন শিশু-বৃদ্ধ-নারী এবং ধর্মীয় পণ্ডিত-পুরোহিত যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না তাদেরকে হত্যা করবে না।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৬১৪)

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড,পৃ: ৭৬৮)

সুতরাং এ হলো মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ এবং ইসলামের শিক্ষা।

এখন সারিয়্যা রাজী'র উল্লেখ করব। যেহেতু এর বিবরণ দীর্ঘ তাই কিয়দাংশ আজ উপস্থাপন করব। এ সারিয়্যার আমীর মারসাদ বিন আবি মারসাদ এর

নাম অনুসারে একে সারিয়্যা মারসাদ বিন আবি মারসাদও বলা হয়ে থাকে, কিন্তু অধিক প্রসিদ্ধ নাম হল রাজী।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২)

রাজী বনু হুযায়েলের একটি ঝর্ণার নাম যা হিজাযে অবস্থিত। এর বর্তমান নাম বাতিয়া যা মক্কা থেকে সত্তর কি.মি. উত্তরে অবস্থিত।

(দায়েরায়ে মারেফ, সীরাতুন নবী রসুলুল্লাহ্, ৭ম খণ্ড, পৃ ;১৩৮-১৩৯)

এ সেনাভিযান ৪র্থ হিজরির সূচনাতে রাজী'তে সংঘটিত হয়েছিল। ইবনে ইসহাক এবং ইবনে হিশাম-এর মতে এ সারিয়্যা উহুদের যুদ্ধের পর তৃতীয় বছরে সংঘটিত হয়েছিল। বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী এবং মাওয়াহেব এ লিপিবদ্ধ আছে, এটি তৃতীয় হিজরির শেষের দিকে সংঘটিত হয়েছিল।

(সীরাত ইবনে ইসহাক, পৃ: ৩৭১)(ইবনে হিশাম, পৃ: ৫৯১) (আলমোয়াহিবুল লাদানিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১৬) (ফতহুল বারি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৮৩)

আমাদের রিসার্চ সেল সারিয়্যা রাজী'র বিষয়ে একটি নোট দিয়েছে । এই সেনাভিযান কখন কোন তারিখে সংঘটিত হয়েছে সে প্রেক্ষাপটে এটি মনোযোগের দাবি রাখে । যাইহেক যারা গবেষণা করেন তাদের জন্য এটি উপকারী হতে পারে তাই আমি এটিও পড়ে দিচ্ছি। ইতিহাস ও জীবনগ্রন্থগুলোতে এমনকি বুখারীতেও রাজী এবং বে'রে মাউনা'র ঘটনাকে পরস্পর গুলিয়ে ফেলা হয়েছে আর কতক জীবনীকার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন। এতে একটি ভু ল এটিও হয়েছে যে, অধিকাংশ জীবনীকার রাজী সেনাভিযানের তারিখ চতুর্থ হিজরির সফর মাস উল্লেখ করেছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, হযরত খুবায়েব এবং হযরত যায়েদকে মক্কায় বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল. কিন্তু নিষিদ্ধ মাস শুরু হওয়ার কারণে মক্কাবাসীরা তাদেরকে বন্দি করে রাখে এবং সম্মানিত মাস শেষ হওয়ার পর তাদের উভয়কে হত্যা করে। অধিকাংশ জীবনীকার এটিই বর্ণনা করেন, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, নিষিদ্ধ মাস তো চারটি। তিনটি পর্যায়ক্রমে রয়েছে অর্থাৎ, যিলক্বদ, যিলহজ্জ এবং মুহররম আর মুহররমের পাঁচ মাস পর চতুর্থ মাস রজব। এখন যেহেতু এই সারিয়্যা সফর মাসে সংঘটিত হয়েছিল তাই প্রথম তিন সম্মানিত মাস তো পূর্বেই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। এখন সফরের চার মাস পর সম্মানিত চতুর্থ মাস আসার কথা। তাই যদি এ সারিয়্যা চতুর্থ হিজরির সফর মাসে হয়েছিল বলে মানা হয় তাহলে এটি বলা যে, নিষিদ্ধ মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল তা বিবেকসম্মত নয়। একইভাবে যদি সম্মানিত মাস না-ই হয়ে থাকে তাহলে তাদের উভয়কে এতদিন বন্দি করে রাখার কোন মানেই হয় না। মক্কাবাসীরা তাদেরকে দ্রুত থেকে দ্রুততর সময়ে হত্যা করে নিজেদের প্রতিশোধের জ্বালা নিবারণ করতে চাচ্ছিল, তাই অযথা তাদেরকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বন্দি রাখার, পানাহার করানোর এবং তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়ার কী দরকার ছিল? যে সমস্ত জীবনীকার এবং ঐতিহাসিক এটিকে চতুর্থ হিজরির সফর মাসেসংঘটিত হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন, তারা এসব প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি। আমাদের কাছে দু টি পথের মাঝে একটি রয়েছে আর তা হল, হয়ত সম্মানিত মাস এবং তাদের দুজনের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বন্দি থাকার বিষয়টি সঠিক নয় অথবা আমাদের এটি বলতে হবে যে, এ সমস্ত রেওয়ায়েত সঠিক অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসও আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা বন্দিও ছিলেন। অবশ্য এ পরিস্থিতিতে এটিও মানতে হবে যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকারের এ সারিয়্যার তারিখ সংরক্ষণে ভুল হয়েছে। আর এ শ্রেণীর ঐতিহাসিকের কথা অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় যারা বলে যে যখন মক্কায় বিক্রি করা হয় তখন পবিত্র মাস অর্থাৎ যি-কাদা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল- অবশ্য তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। যেমন সীরাত ইবনে ইসহাক যা সবচেয়ে প্রাচীন জীবনীমূলক গ্রন্থের একটি এবং সীরাত ইবনে হিশাম- উভয়টি রাজী-র অভিযান-ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, উহুদের যুদ্ধের পর ৩য় হিজরীতে এ অভিযান সংঘটিত হয় এবং বুখারীর একজন বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ভাষ্যকার ইবনে হাজর 'ফাতহুল বারী'-তে এ মর্মে বর্ণনা করেন, এ ঘটনা ৩য় হিজরীর শেষে সংঘটিত হয়। এ প্রেক্ষাপটেসীরাতের আরো একটি বই 'মাওয়াহেবুল লিদ্দুনিয়া'-তেও লেখা আছে, তাই এটিই সর্বাধিক সঠিক বলে মনে হয়, এ অভিযান ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষের দিনগুলোতে সংঘটিত হয়। আর ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে যেহেতু হযরত খুবায়েব এবং হযরত যায়েদ (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল এবং তাদের শাহাদতের সংবাদ যখন মদীনায় পৌঁছে তখন রেওয়ায়েতে এই তারিখগুলো ধীরে ধীরে স্থান করে নেয়।

যাইহোক, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।এই অভিযানের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে লেখা আছে, বিগত অভিযান তথা আব্দুল্লাহ বিন আনীস অভিযানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনু লিহইয়ান-এর সর্দার সুফিয়ান বিন খালিদকে হত্যা করা হয় যে-কারণে এই গোত্র প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছিল আর রাতদিন মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার উপায় নিয়ে ষড়যন্ত্রের জ্বাল বুনতে থাকে? সুতরাং এই গোত্রের কিছু লোক আযল ও কারা গোত্রের নিকট আসে। এরা ভীষণ দক্ষ তিরন্দাজ ছিল। আযল বনু হাওন বিন খুযায়মা-র একটি শাখা যা আযল বিন দাইশ-এর প্রতি আরোপিত হতো। কারা গোত্রও হাওন-এর একটি শাখা ছিল যা দাইশ-এর প্রতি আরোপিত হতো। বনু লিহইয়ান তাদের বলল, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে মদীনায় যাও এবং তাঁর নিকট তোমাদের গোত্রে ইসলামের তবলীগ ও বাণী প্রচারের নামে কিছু লোক তোমাদের সাথে পাঠানোর আবেদন জানাও। আর পুরো আশা করা যায়, মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের সাথে তাঁর কিছু লোক দিয়ে পাঠাবেন। মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীরা তোমাদের সাথে আসলে, আমরা তাদেরকে মক্কার লোকদের কাছে বিক্রি করে দেবো যার বিনিময়ে আমরা বিপুল অর্থ লাভ করব এবং মক্কাবাসী তাদেরকে হত্যা করবে। এর ফলে আমাদের প্রতিশোধ পিপাসারও নিবারণ হবে এবং এ ধনসম্পদ থেকে আমরা তোমাদেরকেও একটি অংশ দান করব। অতএব এ যথারীতি ষড়যন্ত্র এঁটে আযল ও কারা গোত্রের সাত ব্যক্তির একটি দল মদীনায় আসে এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে বলে, আমাদের গোত্রে ইসলাম অনেক জনপ্রিয়, তাই আপনি আপনার কিছু লোক আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করুন যারা সেখানে ইসলাম প্রচারের কাজ করবেন। সে দি নগুলোতে মহানবী (সা.) দশ ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি দল প্রস্তুত করেছিলেন যাদের দায়িত্ব ছিল, মক্কার আশপাশে গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে অবস্থা পর্যালোচনা করা। আগত এই দলটি দেখে মহানবী (সা.) দশ ব্যক্তির এই দলকে তাদের সাথে প্রেরণ করেন।

(সীরাত এনসাক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ৪৪৮-৪৪৯)

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) তাদের সাথে সাতজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলেন। (সুবুলুল হুদা, ওয়ার রাশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ০)

ইবনে হিশাম লেখেন, তিনি (সা.) ছয়জন সাহাবী তাদের সাথে প্রেরণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে ইবনে সাদ বলেন, তারা দশজন ছিলেন এবং এর মাঝে সাতজনের নাম উল্লেখ করেন।(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৩২)

সহীহ বুখারীতে দশজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সীরাতের অধিকাংশ বইপুস্তকে দশজন সাহাবীর উল্লেখ রয়েছে, যদিও নাম কেবল সাতজনের পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) হযরত আসিম বিন সাবিত (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করেন আবার কেউ কেউ বলে, হযরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ গানভী (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৩৯৮৯)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হিজরতের ৪র্থ বছর আরবের দুটি গোত্র আযল এবং কারা নিজেদের প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করে নিবেদন জানান, আমাদের গোত্রের অনেক মানুষ ইসলামের প্রতি অনুরক্ত। (তারা) ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত (এমন) কয়েকজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করার আর্জি জানিয়েছে যেন তারা তাদের মাঝে অবস্থান করে তাদেরকে এই নতুন ধর্মের শিক্ষা প্রদান করতে পারে। আসলে, এটি একটি চক্রান্ত ছিল যা ইসলামের চরম শত্রু বনু লিহইয়ান করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এই প্রতিনিধি দল মুসলমানদেরকে নিয়ে আসলে তাদেরকে (অর্থাৎ মুসলমনাদেরকে) হত্যা করে নিজেদের নেতা সুফিয়ান বিন খালিদের প্রতিশোধ নেবে। অতএব, তারা 'আযল এবং কারা (গোত্রের) প্রতিনিধি দলকে পুরস্কারের বড়ো বড়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে কতক মুসলমানকে সাথে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-এর সমীপে প্রেরণ করে। 'আযল ও কারা গোত্রের সদস্যরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে পৌঁছে নিবেদন করলে তিনি (সা.) তাদের কথায় আস্থা রেখে দশজন মুসলমানকে তাদের সাথে প্রেরণ করেন যেন তারা তাদেরকে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং রীতিনীতি সম্পর্কে শিক্ষা দেন।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৬০)

অতঃপর তারা (তাদের সাথে) যান। পরবতীতে যে ঘটনাসমূহ রয়েছে তা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

আজকে আমি পুনরায় ইয়েমেনের কারাবন্দিদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। বিশেষকরে সেই ভদ্রমহিলার জন্য, যিনি সেখানকার লাজনার সদর। তাকে চরম কঠিন অবস্থায় কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। যারা তাদের কথা মানতে নারাজ এমন আরো কয়েকজন সদস্যকেও কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের মুক্তির উপায় সৃষ্টি করুন। পাকিস্তানের কারাবন্দিদের মুক্তির জন্যও দোয়া করুন। ফিলিস্তিনের লোকদের জন্যও দোয়া অব্যাহত রাখুন। সেখানে পরিস্থিতি ভাল হতে হতে আবার খারাপের দিকে চলে যায়। ইসরাঈলি সরকার নির্লজ্জভাবে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে (ফিলিস্তিনবাসী) তাদের অত্যাচারনিপীড়নের হাত থেকে অতিশীঘ্রই মুক্তি দান করুন এবং মুসলমানদেরকেও নিজেদের দায়িত্ব (যথাযথভাবে) পালন করার তৌফিক দান করুন।

****

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মানী সফর, ২০২৩ (সেপ্টেম্বর)

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

(শেষাংশ....)

কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ পেয়ে জানতে পারলাম তিনি অনেক জীবনী শক্তিতে ভরপুর এবং তাঁর মধ্যে রসবোধ রয়েছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হওয়া আমার জন্য খুব সুখকর মুহূর্ত ছিল। একদিকে খলীফা আধ্যাত্মিকতার উচ্চামার্গে অধিষ্ঠিত, কিন্তু অপরদিকে তিনি সহানুভূতিশীল এবং সদয়। এই কারণে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করা আমার জন্য বিশেষ এবং বিরল মুহূর্ত ছিল।

ওয়ানযেক হলেন একজন চার্চের প্রতিনিধি। তিনি বলেন,খলীফার ভাষণ চমৎকার ছিল আর তার কথা থেকে নতুন ও শুভ আশার সৃষ্টি হয়। আমি মনে করি, তিনি এদেশের জন্যও এবং সারা বিশ্বের জন্য পথ সুগম করছেন, যাতে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে। এই কারণে খলীফার ভাষণ আমার জন্য একটা শুভ বার্তা। তাঁর ভাষণ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে আশার বাণী । তিনি একজন সম্ভ্রমশীল ব্যক্তিত্ব। তাঁর আগমণের হলঘরের পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে যায়। তাঁর একটা বিষয় আমার ভাল লেগেছে যে, তিনি প্রস্তুতকৃত কোন ভাষণ পাঠ করেন নি,বরং সময়োপযোগি একটি ভাষণ দিয়েছেন।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, খলীফার মধ্যে এক বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় আর তা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর ভাষণের সমস্ত কথা আমার হৃদয়ে রেখাপাত করেছে।

মাউরিযিও ট্রিগিলিয়া বলেন, খলীফার ব্যক্তিত্ব থেকে শান্তি অনুভূত হয়। তিনি অনেক উদার মনের মানুষ। তিনি আমাকে প্রভাবিত করেছেন। তাঁর কারণেই ইসলাম সম্পর্কে ধারণা অনেক উন্নত হয়েছে।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, আমি ঘটনাক্রমে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে আমি আনন্দিত। খলীফা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ধরে তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। আমি আপনাদের জামাতের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ রাখব।

আরও এক ভদ্রমহিলা বলেন, আমি খলীফার ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়েছি। খলীফা বলেছেন, যুদ্ধের মত সংকটাবস্থার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। আমি তাঁর এই কথার সঙ্গে সহমত। তাঁর ভাষণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ছিল।

ওয়ে নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন, খলীফা প্রতি সপ্তাহে খুতবার মাধ্যমে নসীহত করে থাকেন। আপনারা সৌভাগ্যবান যে, আপনাদের একজন ইমাম আছেন যিনি আপনাদেরকে বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করেন আর প্রতি সপ্তাহে আপনাদের পথপ্রদর্শন করেন। আমরা ইমাম বা নেতা না থাকার কারণে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় রয়েছি। এই অনুষ্ঠানে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল আর সমস্ত কর্মীদের মুখে হাসি ছিল আর তারা সুন্দরভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলছিল।

একজন অতিথি বলেন, ইমামের ভাষণ পূর্ণাঙ্গ ছিল। তিন কন্যা সন্তান প্রতিপালনকারী ও তাদেরকে শিক্ষাদানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) বর্ণিত হাদীসটি আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। কেননা, আমার নিজেরও তিন কন্যাসন্তান আছে।

একজন অতিথি প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী। তিনি বলেন, আমার এটা ভাল লেগেছে যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে একটা শ্রেণী কতিপয় ইসলামী শিক্ষার উপর আলোকপাত করেছে। ইসলামে যে সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা নেই বরং এক মহান শিক্ষা দান করে, সেকথা আমাদের মত মানুষদেরকে জানানো ভীষণ জরুরী।

বান্টেল ম্যানফ্রেড নামে এক অতিথি বলেন, খলীফার ভাষণদানের পদ্ধতি খুব সুন্দর। খলীফা অত্যন্ত নীরব প্রকৃতির বলে মনে হয়। আপনাদের ইমামের ভাষণ আমার অনেক প্রশ্নের সমাধান বলে দিয়েছে। খোদা ভাল জানেন যে, তিনি এত কম কথায় কিভাবে নিজের অবস্থান বর্ণনা করেছেন। হয়তো এটা পবিত্র মানুষদের এক বিশেষ গুণ।

এনিশ ডোরোথি এক ভদ্রমহিলা বলেন, খলীফার ভাষণ অত্যন্ত উচ্চমানের ছিল। ভাষণ শুনে খুব আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, খুব কম সংখ্যক মুসলমান নিজেদের ধর্মকে এভাবে উপস্থাপন করে। আমি আশা করি, সংবাদ মাধ্যমও এই বার্তাটি নিশ্চয় শুনেছে আর ইসলামের এই উচ্চমানের শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছেও পৌছনো উচিত।

রুখসাতানা অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অংশগ্রহণ

আতিয়া কুদুস সাহেবা বিনতে মাস্টার আব্দুল কুদুস সাহেব শহীদের রুখসাতানা অনুষ্ঠানে হুযুর অংশগ্রহণ করেন।

মাস্টার আবউদল কুদুস সাহেব অফ রাবোয়া পুলিস আধিকারীদের হাতে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে গত ৩০ শে মার্চ ২০১২ তারিখে শহীদ হয়ে যান।

হুযুর আনোয়ার ৬ই এপ্রিল ২০১২ তারিখের জুমআর খুতবায় শহীদ মরহুমের শাহাদতের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন-'এই সংকল্প ও উৎসাহের অধিকারী নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, কিন্তু মিথ্যা সাক্ষী দেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যাকেও শিরকের সমকক্ষ আখ্যায়িত করেছেন। এই মহান আমাদের একদিকে যেমন এই শিক্ষা দান করে যে, জামাত আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত করার যে উদ্দেশ্য, অর্থাৎ একত্ববাদের প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের প্রাণের তোয়াক্কা করেন নি, কেননা মিথ্যা বলাও শিরকের সমতুল্য আর আমাদের দ্বারা শিরক হতে পারে না। শহীদ মরহুম যদি নির্যাতনের কারণে পুলিশকে তাদের পছন্দ মত বয়ান দিতেন, যেমনটি তারা বলে এসেছিল, তবে সামগ্রিকভাবে এর পরিণাম জামাতের জন্যও অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারত।.....

অতএব, হে কুদুস! আমরা তোমাকে সালাম করি। কেননা, তুমি নিজেকে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দেওয়াকে সহ্য করেছ, কিন্তু জামাতের সম্মানে কোন আঘাত আসতে দাও নি। তুমি নিজের প্রাণের বিনিময়ে জামাতকে এক বিরাট বড় ফিতনা থেকে রক্ষা করেছ। তাই মাস্টার আব্দুল কুদুস সাহেব একজন সাধারণ শহীদ নন, বরং শহীদদের মধ্যেও তাঁর উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী থেকে একদিন সকলে বিদায় নিবে, কিন্তু মাস্টার আব্দুল কুদুস সাহেব সৌভাগ্যবান, যাকে খোদা তা'লা জীবিত রেখেছেন। তিনি এমন রিযক লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন যা জাগতিক রিযক থেকে অনেক উন্নত মানের। যে জামাত ও যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আত্মত্যাগ করেছেন, সে সম্পর্কে প্রকৃত আনন্দের বিষয়ে তিনি তো পরকালে গিয়ে অবগত হবেন। কিন্তু শহীদ মরহুম আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, সেই শিক্ষা আমাদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْل অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক। তাই পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন আল্লাহ তা'লার আঁচল ত্যাগ করবে না। এই শিক্ষাই তিনি দিয়ে গিয়েছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও বলেছেন, জগতবাসী তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যদি আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে তোমাদের সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকে।

কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। দোয়ার পর নযম পরিবেশিত হয় এবং এরপর হুযুর আনোয়ার দোয়া করেন।

নিকাহর ঘোষণা

১। শাহিদা মগফুর, পিতা-মগফুর আহমদ ও সাইফুর রহমান (মুবল্লিগ সিলসিলা, জার্মানী), পিতা-আব্দুর রহমান নাসের।

২। ওজীহা আনোয়ার (ওয়াকফা নও) পিতা- রফীরুর রহমান আনোয়ার সাহেব ও আসিম বিলাল আরিফ (ওয়াকফে নও), পিতা নাসীর আহমদ আরিফ সাহেব।

৩। নুরাইন ফারুক (ওয়াকফা নও), পিতা আসিফ ফারুক সাহেব এবং নুমান খালিদ (জামিয়া আহমদীয়া জার্মানীর ছাত্র) পিতা খালিদ মাহমুদ সাহেব।

৪। সাওবানা নাঈম (ওয়াকফা নও), পিতা নাঈম আহমদ বাজওয়া সাহেব এবং হাসীব আহমদ (জামিয়া আহমদীয়া জার্মানীর ছাত্র) পিতা মুবারক আহমদ ঘুম্মান সাহেব।

৫। আমাতুল হাদী আলিয়া নুর হিবশ,পিতা হিদায়াতুল্লাহ্ হিবশ সাহেব এবং তাহের নাদীম চৌধুরী (ওয়াকফে নও), পিতা নুরুদ্দীন চৌধুরী সাহেব।

৬। দুররে আযম লোন (ওয়াকফা নও) পিতা সাঈদ আহমদ লোন সাহেব এবং মহম্মদ যুরথিস্ত হিবশ, পিতা হিদায়াতুল্লাহ হিবশ সাহেব।

৭। সায়েমা আনআম বাজওয়া (ওয়াকফা নও), পিতা তাহের আহমদ বাজওয়া সাহেব এবং মহম্মদ আতহার কাহলোঁ (ওয়াকফে নও), পিতা মহম্মদ আসগার কাহলোঁ সাহেব।

উপরোক্ত নিকাহর ঘোষণার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন এবং দোয়ার পর সকলের সঙ্গে করমর্দন করেন।

বুলগেরিয়া থেকে আগত অতিথিদলের সঙ্গে সাক্ষাত

এবছর বুলগেরিয়া থেকে ৭৬জন অতিথি জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাদের মধ্যে পঞ্চাশ জন অতিথি ৩০ ঘন্টারও বেশি সময় সফর করে এখানে পৌঁছেছিলেন। অতিথিদের মধ্যে ৪৬জন খৃষ্টান এবং অ-আহমদী ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে জিজ্ঞাসা করেন জলসা কেমন লাগল এবং তাঁদের মতামত কি?

দলের এক সদস্য বলেন, আমি পূর্বেও জলসাও যোগদান করেছি। এবছর খুব ভাল লাগল। জলসার সমস্ত ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নত মানের ছিল। বক্তব্যগুলি আমরা মন দিয়ে শুনেছি। হুযুরের বক্তব্য আমাদেরকে

প্রভাবিত করেছে। জামাত আহমদীয়া পৃথিবীকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

* জামিয়া আহমদীয়া জার্মানীতে বুলগেরিয়ান ছাত্র আব্দুল্লাহ্ শিক্ষারত আছেন। তাঁর পিতা প্রশ্ন করেন যে আব্দুল্লা কি ভাল শিক্ষা অর্জন করছে? হুযুর বলেন, যে শিক্ষা যে অর্জন করছে তা খুবই ভাল। সে কতটা শিখেছে তা তো জানা নেই, কিন্তু জামেয়া পাশ করার পর তাকে প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। আশা করি, সে বুলগেরিয়ার জন্য একজন ভাল মুবাল্লিগ হয়ে উঠবে। খোদা তা'লা তৌফিক দিন, সে যেন বিনয়ের সাথে নিজের উৎসগীকরণকে স্বার্থক করে তুলতে পারে। আব্দুল্লাহ্র পিতা ইব্রাহিম সাহেব একদিন গর্ব করে বলবেন 'আমার ছেলে মুবাল্লিগ।'।

আব্দুল্লাহ্র পিতা বলেন, আমার ছেলের জন্য এমন মেয়ে চাই যে জামাতের জন্য কল্যাণকর হবে। পাকিস্তানি হোক বা অন্য কোন দেশের। ভাল কোন মেয়ে দরকার যাতে জামাতের জন্য কল্যাণের কারণ হয়।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, আমার সম্পর্ক ইয়েমেনের সঙ্গে। বুলগেরিয়াতে পি.এইচ.ডি করছি। হুযুর আনোয়ার যে শিক্ষা বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে সে মুসলমান, এই শিক্ষা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই শিক্ষা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। কুরআন করীমে লেখা আছে, যে ব্যক্তি খোদার পথে শহীদ হয়, সে জীবিত। এবং খোদার সন্নিধান থেকে তার রিযক দেওয়া হয়। এর কি অর্থ?

হুযুর আনোয়ার বলেন পাকিস্তানে আমাদের অনেক আহমদীকে শহীদ করা হয়েছে। যেহেতু তারা ধর্মের কারণে প্রাণ দিয়েছেন, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, সত্যকে চিনেছে, নিজেদের ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়েছে তাই খোদা তা'লা তাদেরকে বিনষ্ট করবেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইহলৌকিক জীবন অস্থায়ী। মৃত্যুর পর যে জীবন লাভ হয় সেটি হল পরলৌকিক জীবন। যাকে রিযক দেওয়া হবে তা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হবে। পদমর্যাদা উচ্চ হবে যা অনুমান করা যায় না। শহীদদের বংশধররাও তার থেকে উপকৃত হয় এবং জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক উন্নতি করে।

শহীদদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা যে বলেছেন, তারা জীবিত। এর অর্থ হল তাদের কাজ অমর হয়ে থাকবে। যে ধর্মের কারণে তারা আত্মত্যাগ করেছে সেই ধর্মে আও জীবন সৃষ্টি হবে। অভূতপূর্ণ উন্নতি হবে ও অসাধারণ সফলতা লাভ হবে আর শহীদদের বংশধররাও তার থেকে লাভবান হবে।

ইয়েমেনের কথা বলতে গেলে মুসলমানেরা সেখানে একে অপরকে হত্যা করছে, পরস্পর হানাহানি করছে। তাই খোদা তা'লা তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবেন তা তিনিই জানেন।

কিন্তু একটি দেশের উপর জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হলে, যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হলে, আত্মরক্ষার জন্য যদি অস্ত্র ধারণ করে, আর আত্মরক্ষা করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয় সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে।

এখন ইয়েমে যুদ্ধ হচ্ছে, শিয়া ও সুন্নীর মধ্যে হানাহানি খুনোখুনি চলছে। সিরিয়াতে শিয়া ও সুন্নী পরস্পরকে হত্যা করছে। ইসলাম এই ধরণের অত্যাচারের মোটেই অনুমতি দেয় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই কারণেই তো হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এর আবির্ভাব আবশ্যক ছিল, যাতে তিনি সমস্ত মুসলমান ও ফির্কাদেরকে একত্রিত করেন। এখন মসীহ মওউদকে মান্য করার মধ্যেই মুসলমানদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

প্রশ্ন করা হয়েছে, যে আয়াতে বলা হয়েছে যে শহীদরা জীবিত আছে, সেই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা হয় যে হযরত ঈসা (আ.) জীবিত আছেন আর তাঁকে রিযক দেওয়া হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হযরত ঈসা (আ.) যদি আকাশে জীবিত থাকেন, তবে শহীদরা সকলে জীবিত আছেন। তাই এই আয়াতের ভুল অর্থ বের করবেন না। এছাড়া ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে আরও যে সব আয়াত আছে,সেগুলি প্রণিধান করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রথমে মৃত্যুর উল্লেখ করেছেন অতঃপর তুলে নেওয়ার (উত্তীর্ণ করার) উল্লেখ করেছেন। যদি ঈসা (আ.) জীবিত থাকেন আর তাঁকে রিযক দেওয়া হয়ে থাকে, আর তাঁর ফিরে আসার কথা মানতে হয়, তবে সেই একই আচরণ অন্যান্য শহীদদের সঙ্গেও করা হবে। সেক্ষেত্রে হযরত ঈসা (আ.)-এর পার্থক্য কি বাকি থাকল?

প্রশ্নকারী ব্যক্তি বলেন, আমি পূর্বে এই বিশ্বাস পোষণ করতাম যে, ঈসা (আ.) জীবিত আছেন। হুযুর আনোয়ারের ভাষণসমূহ শুনে আমার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন- জীবিত নবী হলেন নবী করীম (সা.)। জীবন্ত পুস্তক হল কুরআন করীম এবং জীবন্ত ধর্ম হল ইসলাম আর ইসলামী বিধান। যদি মৃত কোন নবীই আসত, তাও আবার বানী ইসরাঈল জাতির কোন নবী। তবে আমাদের আত্মাভিমান সহ্য করবে না যে বনী ইসরাঈল জাতির কোন নবী আমাদের হিদায়াতের জন্য আসুক। কাজেই কোন মৃত নবী আসবে না। আঁ হযরত (সা.)-এর উম্মতের মধ্য থেকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে মাহদী ও মসীহ হযরত ঈসা (আ.)-এর রূপক হয়ে আসার কথা ছিল, তিনি এসে গেছেন। আজ পৃথিবীর মুক্তি ও শান্তি সেই সত্তার সঙ্গেই সম্পৃক্ত।

একজন অতিথি বলেন, আমি একজন খৃষ্টান। জলসার আয়োজন খুব ভাল ছিল। আমাদের সব রকম সেবা করা হয়েছে।

আমার প্রশ্ন হল, সমগ্র জগতের স্রষ্টা এক ও অভিন্ন। তাই আকাশ থেকে যদি কেউ আসে তবে পৃথিবীতে বিবাদের উৎপত্তি হবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, খৃষ্টানরা পিতা-পুত্রের তত্ত্ব তুলে ধরে। অনেক সময় পুত্র বিশৃঙ্খলা তৈরী করে। দুই খোদা হলে পৃথিবীতে অরাজকতা সষ্টি হবে। তিনি যদি আকাশ থেকে নাও আসেন, আকাশেই বসে থাকেন আর সেখান থেকেই নিজের নির্দেশ দিতে থাকেন, সেক্ষেত্রেও পৃথিবীতে বিবাদ-বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

হযরত ঈসা (আ.) বনী ইসরাঈল জাতিতে এসেছিলেন তাদের সংশোধনের জন্য। তিনি নিজের কাজ পুরো করে বিদায় নিয়েছেন।

আঁ হযরত (সা.)এর আবির্ভাব ঘটল এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শেষে যুগে তাঁরই অনুসরণে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)এর আবির্ভাব ঘটল। তাঁকে জামাত আহমদীয়া মেনে নিল। জামাত এখন তাঁর শিক্ষা মেনে চলছে।

একজন অতিথি প্রশ্ন করেন যে, পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম আছে, সবগুলিতেই জান্নাত ও দোযখের শিক্ষা আছে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ হানাহানি-খুনোখুনিতে লিপ্ত থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- কোন ধর্মই মানুষ খুন করার শিক্ষা দেয় নি। আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলেছেন যে, সৎকর্ম করলে প্রতিদান পাবে আর পাপ করলে তার শাস্তি পাবে। কুরআন করীমে জান্নাতান (দুটি জান্নাত) বলেছেন। ইহজগতে সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত আছে আর পরকালেও জান্নাত আছে। আর যারা খুনোখুনি ও হানাহানির শিক্ষা দেয়, তাদের কাজ শয়তানী কাজ। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমের সূচনাতেই রূপকভাষায় এর উল্লেখ করেছেন। সৎকাজ করলে জান্নাতে যাবে আর কলহ-বিবাদের মত অসৎ কাজ করলে শাস্তি ভোগ করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন-জামাত সৎকর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করে। জামাত শান্তির শিক্ষা দিচ্ছে; সেই বাণী দিচ্ছে যা খোদার বাণী। জামাত আহমদীয়া মানবতার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত রাখে। কাজেই জামাতের বার্তা অনুসরণ কর, পুণ্য কর্ম কর।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ধর্মই যদি বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে, তবে জামাতের মধ্যে ধর্ম তো কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নি। জামাত হত্যা করার শিক্ষা দেয় না। বরং শান্তির শিক্ষাই দিয়ে চলেছে। যেভাবে জাগতিক নিয়মে অসৎকর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করে, ঠিক তেমনি খোদার নিয়ম আছে যেখানে অসৎকর্মশীলরা শাস্তি পায়।

এক ভদ্রমহিলা বলেন- আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের গোটা ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুসংগঠিত ও উৎকৃষ্ট মানের ছিল। আমি হুযুর আনোয়ারে সমস্ত বক্তব্য শুনেছি। একথা আমাকে বলতেই হবে যে, যদি শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলে এই বক্তব্য শোনে, তবে তাদের সর্বোত্তম তরবীয়ত হতে পারে। আমি আমার নাতি ও নাতিনীর জন্য দোয়ার আবেদন করছি, কেউ যদি বুলগেরিয়ায় থাকে তবে তাদেরকে দেখাশোনা ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করুক, যাতে এর নষ্ট না হয়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন- বুলগেরিয়ার আইন এই অনুমতি দেয় না। বুলগেরিয়ান মুবাল্লিগরা তৈরী হয়ে সেখানে যাবে। আমরা দোয়া করছি,আপনিও দোয়া করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা সেদেশের সরকারকে তৌফিক দিন যাতে তারা দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে আর মোল্লাদের পিছনে না চলে। বরং সত্যকে চেনার জন্য খোলা সুযোগ ও স্বাধীনতা দেয়।

প্রতিনিধি দলের এক সদস্যরা হুযুর আনোয়ারের ভাষণগুলির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, পৃথিবী যদি হুযুর আনোয়ারের কথা মেনে নেয়, সেই নির্দেশ মেনে চলে,তবে ধবংস থেকে রক্ষা পাবে।

ইতেম সাহেব সপরিবারে জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। ভদ্রলোক কয়েকবছর পূর্বে খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আহমদী হওয়ার পূর্বে এক খৃষ্ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেখানে বেশ ভাল চাকরী করছিলেন। কিন্তু আহমদী হওয়ার পর সমস্ত সুযোগ ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে পৃথক হয়ে গেছেন।

ভদ্রলোক বছর কয়েক পূর্বে যুক্তরাজ্যের জলসায় হুযুর আনোয়ারে সঙ্গে সাক্ষাতের পর বয়আত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

তাঁর স্ত্রীর বক্তব্য ছিল এই যে,

(এরপর ১১ পাতায়.....)

ঠোকর মেরে নামায পড়া হবে। আর এ প্রসঙ্গে আমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদর্শিত একটি তারাবীর নামাযের উল্লেখ করেছিলাম, যেখানে ইমাম কয়েক মিনিটের মধ্যে তারাবীর নামাযের সকল রাকাত পড়িয়ে দেয়।

অতএব, আসল বিষয় ছিল, নামায এতটা দীর্ঘ করাও উচিত নয় যে, মুক্তাদী বিরক্ত হয়ে যায় এবং তার হৃদয়ে নামাযের প্রতি ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়।

আবার নামায সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে নামাযের নামে কেবল মাথা ঠুকারও অনুমতি নেই। এছাড়া এর সাথে একথাও স্মরণ রাখতে হবে, মহানবী (সা.) যে নামায সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন তা হল, ফরয নামায। আর এর কারণ হল, ফরয নামায প্রত্যেক পুরুষের জন্য বা-জামা'ত পড়া আবশ্যক। মহানবী (সা.) বলেছেন,

মুক্তাদীদের মধ্যে যেহেতু অসুস্থ, বৃদ্ধ, দুর্বল এবং কাজকর্মে যাওয়ার লোকজনও থাকে তাই এদের সবার প্রতি খেয়াল রেখে যথোপযুক্ত সময়ের মধ্যে নামায পড়ানো ইমামের দায়িত্ব। কিন্তু তারাবীর নামায যেহেতু নফল আর এর জন্য এমন কোন শর্ত নেই যে, সব মানুষ অবশ্যই এতে যোগদান করবে; বরং যে সহজে এতে যোগ দিতে পারে তার যোগ দেওয়া উচিত। আর যার কোন সমস্যা আছে সে যোগ না দিলে কোন অসুবিধা নেই। দ্বিতীয়ত, তারাবীর নামাযের প্রচলন হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে হয়েছিল। আর তিনি (রা.) বিশেষভাবে পবিত্র কুরআনের ক্বিরাআত বা কুরআন শোনানোর জন্যই এর প্রবর্তন করেছিলেন। একারণেই এতে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ তেলাওয়াত হওয়া উচিত আর যদি সম্ভব হয় তাহলে পবিত্র রমযানে তারাবীর নামাযে পুরো কুরআন সম্পন্ন করা উচিত।

প্রশ্ন: একজন ভদ্রমহিলা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিজের ভাইয়ের মৃত্যুর উল্লেখ করে বিধবার শোক এবং অন্যদের শোক, বিশেষকরে ভাইয়ের মৃত্যুতে বোনের শোক পালন সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষামালা জানতে চেয়েছেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর বলেন, ইসলাম তার অনুসারীদের আনন্দ-বেদনার প্রতিটি ক্ষেত্র পালনের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। যেমন, কোন প্রিয়ভাজনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেওয়ার পাশাপাশি তার বিয়োগ বেদনা প্রকাশেরও অনুমতি দিয়েছে। আর সকল আত্মীয়-স্বজনকে, যাদের মধ্যে প্রয়াত ব্যক্তির পিতামাতা, ভাইবোন এবং সন্তান-সন্ততি সবাই এতে অন্তর্ভুক্ত আছে। (তাদের) সর্বোচ্চ তিনদিন পর্যন্ত শোক পালনের অনুমতি আছে। তবে, বিধবাকে তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন পর্যন্ত শোক পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় এর উল্লেখ আছে। এছাড়া হাদীসেও মহানবী (সা.) বিভিন্ন উপলক্ষে এর নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, যয়নব বিনতে আবী সালামাহ্ (রা.) {যিনি মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিনী ছিলেন) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, (তিনি বলেন) আমি মহানবী (সা.)-এর শ্রদ্ধেয়া পত্নী হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)-এর কাছে গেলে তিনি আমাকে বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, এমন কোন মহিলা যিনি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখেন তার জন্য সংগত নয় যে, তিনি কারও মৃত্যুতে তিনদিনের বেশি শোক পালন করবেন কেবলমাত্র স্বামীর মৃত্যু ছাড়া। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে সে চারমাস দশদিন শোক পালন করবে। (বর্ণনাকারিণী বলেন,)-এরপর যখন যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর ভাই মারা যান তখন আমি তার কাছে যাই। (আর যখন তার ভাইয়ের মৃত্যুর তিনদিন পার হয়ে যায় তখন) তিনি সুগন্ধি আনান এবং তা নিজের শরীরে লাগান এরপর বলেন, আমার সুগন্ধির প্রয়োজন ছিল না কিন্তু আমি স্বয়ং মহানবী (সা.)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে একথা বলতে শুনেছি যে, 'আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী কোন নারীর জন্য এটি সংগত নয় যে, সে কারও মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করবে; কেবলমাত্র নিজের স্বামীর মৃত্যু ছাড়া। অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যু উপলক্ষে সে চারমাস দশদিন শোক পালন করবে।'

(বুখারী কিতাবুল জানায়েয, বাব: এহদাদিল্ মারআতি আলা গাইরি যওজিহা)

অতএব, বিধবা ছাড়া অন্য সব আত্মীয়-স্বজনের জন্য, তা তারা পিতামাতা হোন, সন্তান-সন্ততি হোক কিংবা ভাইবোনই হোক না কেন-সবার জন্য শুধু তিনদিন শোক পালনের অনুমতি রয়েছে, এর চেয়ে বেশি নয়।

বিধবার জন্য যেখানে (চারমাস দশদিনের) শোক পালনের সীমা নির্ধারণের সম্পর্ক, ইসলাম এক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যতিক্রম রাখে নি আর এই নির্দেশের মধ্যে বয়সেরও কোন তারতম্য নেই। কাজেই, বিধবার জন্য যতটুকু সম্ভব ইদ্দতকালীন এই সময়টি নিজের বাড়িতে কাটানো উচিত। এ সময় সাজগোজ করা, সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করার এবং অপ্রয়োজনে বাড়ি থেকে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি নেই।

ইদ্দত পালনকালীন সময়ে বিধবা তার স্বামীর কবরে দোয়ার জন্য যেতে পারেন, তবে শর্ত হল, কবর যেন সেই শহরেই থাকে যে শহরে সেই বিধবার বাসস্থান। এছাড়া তাকে যদি ডাক্তারের কাছে যেতে হয় তাহলে এটিও অপারগতার গণ্ডিভুক্ত। একইভাবে কোন বিধবার পরিবার যদি তার চাকরীর ওপরই নির্ভরশীল হয় আর কর্মক্ষেত্র থেকে তার ছুটি পাওয়া সম্ভব নয়, এবং বাচ্চাদের স্কুলে আনা-নেওয়া করার এবং বাজার-ঘাট যাওয়ার জন্য তার যদি আর কোন উপায় না থাকে তাহলে এসব বিষয়ই অপারগতার গণ্ডিতে আসবে। এমতাবস্থায় তার (অর্থাৎ বিধবার) জন্য আবশ্যক হল, সে সরাসরি কাজে যাবে এবং কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে আসবে। বাধ্য হয়ে এবং প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাবার শুধু এতটুকুই অনুমতি আছে। কোন প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান বা সভায় যোগদানের অনুমতি নেই।

প্রশ্ন: কোন নারীর একা হজ্জে যাওয়া প্রসঙ্গে দ্বারুল্ ইফতা'র মোহতরম নাযেম সাহেবের পক্ষ থেকে জারীকৃত একটি ফতোয়া সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। হুযূর বলেন,আমার মতে হজ্জ এবং উমরা পালনের জন্য নারীর সাথে কোন মাহরাম পুরুষের থাকার শর্ত একটি সাময়িক নির্দেশ ছিল। ঠিক সেভাবেই যেভাবে সেই যুগে কোন নারীর একা কোথাও সাধারণ ভ্রমণ করাও নিষেধ ছিল। কেননা, সে সময় একেতো সফর খুবই কষ্টসাধ্য এবং দীর্ঘ হতো। পথিমধ্যে কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধার বালাই ছিল না, বরং এর বিপরীতে সফরের সময় (পথিমধ্যে) অনেক বেশি ডাকাতির আশঙ্কা ছিল। যেমন, একবার যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে ডাকাতির অভিযোগ করা হয় তখন তিনি (সা.) ভবিষ্যতে নিরাপদ সফর ব্যবস্থার সুসংবাদ প্রদান করতে গিয়ে হযরত আদী বিন হাতেম (রা.)-কে বলেন,

" তুমি যদিদীর্ঘায়ু লাভ করো তাহলে তুমি দেখবে যে, হাওদায় উপবিষ্ট একজন নারী হীরা থেকে যাত্রা করে গিয়ে ক্বাবা তওয়াফ করবে, (এক্ষেত্রে) আল্লাহ্ ছাড়া তার আর কারও ভয় থাকবে না।"

এই হাদীসেরই শেষদিকে হযরত আদী বিন হাতেম (রা.) বর্ণনা করেন, "আমি হাওদায় উপবিষ্ট নারীকে দেখেছি, সে হীরা থেকে সফর আরম্ভ করে এবং ক্বাবা তওয়াফ করে আর আল্লাহ্ ব্যতীত তার আর কারও ভয় ছিল না।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব)

সেই যুগে হীরা ছিল ইরান সাম্রাজ্যের অধীন একটি শহর, যেটি কূফার নিকটে অবস্থিত ছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সেযুগে এটি কয়েকদিনের সফর হতো। অতএব, সেই যুগে যদি একজন নারী হীরা থেকে যাত্রা করে কয়েকদিনের পথ অতিক্রম করে মক্কায় ক্বাবা গৃহ তওয়াফ করার জন্য আসতে পারে তাহলে বর্তমান যুগে কয়েক ঘণ্টার উড়োজাহাজে সফর করে একজন নারী উমরা এবং হজ্জ ইত্যাদির জন্য কেন যেতে পারবে না?

প্রশ্ন: এক বন্ধু হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেছেন যে, আমি পড়েছি, একজন মু'মিনের জন্য সর্বদা কল্যাণই কল্যাণ আসে কিন্তু অপরদিকে এটিও আছে যে, এই জগৎ মু'মিনের জন্য জাহান্নাম। এর মধ্যে কোনটি সত্য? এছাড়া আরেকটি জিজ্ঞাস্য হল, একবেলার নামায বাদ পড়লে বিগত চল্লিশ বছরের নামায নষ্ট হয়ে যায়- এটি কি সঠিক?

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর বলেন, প্রকৃতপক্ষে একজন সত্যিকার মু'মিনের জাগতিক কোন জিনিসের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। তারা সেগুলো আল্লাহ্র নির্দেশে শুধু সাময়িক সামগ্রী হিসেবে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করে। আর সর্বদা তার দৃষ্টি থাকে আল্লাহ্র প্রীতি ও সন্তুষ্টির প্রতি। কাজেই, একজন মু'মিন যেহেতু জাগতিক বস্তুর পেছনে ছোটে না যাতে তা তার হৃদয়কে আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ ভুলিয়ে না দেয়। তাই জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার ওপর বাহ্যত কষ্ট আসে কিন্তু সে এতে কষ্ট অনুভব করে না বরং সে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে সেই পার্থিব কষ্টকেও সানন্দে সহ্য করে। যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.) দোয়া করেছেন, "হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! কারাগার আমার কাছে

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

সেসব পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিলাসিতার চেয়ে অধিক প্রিয়, যেদিকে এই মহিলারা আমাকে ডাকছে।" (সূরা ইউসুফ: ৩৪)

এর বিপরীতে একজন কাফের যেহেতু এই পার্থিব জীবনকেই নিজের সবকিছু মনে করে আর সর্বদা তার পেছনেই ছুটতে থাকে আর পার্থিব উপকরণাদি খুব ভালভাবে আস্বাদন করে আর সেগুলোই তার পাথেয় হয়। কাজেই, এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, (এই) "জগৎ মু'মিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত"।

নামায সম্পর্কিত আপনার প্রশ্নের উত্তর হল, যদি ভুলে কোন নামায বাদ পড়ে তাহলে মহানবী (সা.) বলেছেন, "যখনই সে-ই নামাযের কথা মনে হবে তখনই সেই নামায পড়ে নিবেন, এটিই সেই নামায ভুলে যাওয়ার কাফ্ফারা। কিন্তু যদি জেনেশুনে নামায পরিত্যাগ করে তাহলে এটি অনেক বড় পাপ আর তওবা (অনুশোচনা), এস্তেগফার, এবং ভবিষ্যতে এমন ভুল না করার অঙ্গীকার করলেই এথেকে ক্ষমা লাভ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে গত ১৫ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে জার্মানি জামা'তের মুরব্বীদের ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠানে একটি প্রশ্ন করা হয় অর্থাৎ 'আমরা কীভাবে হুযূরের সুলতানে নাসীর বা সাহায্যকারী হাত হতে পারি?

এর উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,যুগ-খলীফার সুলতানে নাসীর কিংবা সাহায্যকারী হাত হতে হলে দোয়া ছাড়া এটি সম্ভব নয়। আর দোয়ার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভের জন্য রয়েছে নফল (ইবাদত)। ফরয বা আবশ্যিক ইবাদত তো আপনারা করছেন-ই। আর যদি না করেন তাহলে একজন মুসলমানের যে মৌলিক Category রয়েছে তাতেও শামিল হবেন না। তবে, ফরয আদায় করার পর যে নফল রয়েছে সেটিই হচ্ছে আসল বিষয়, যা আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন করবে। আর (এরফলে) সেবার সুযোগও বেশি লাভ করবেন। আর এতে বরকতও সৃষ্টি হবে এবং যুগ-খলীফার সুলতানে নাসীর হওয়ার সামর্থ্যও লাভ হবে। কাজেই, প্রত্যেক মুরব্বীর জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে (এক ঘণ্টা তাহাজ্জুদ পড়া) আবশ্যক। বর্তমানে (অর্থাৎ শীতকালে) তো এমনিতেই এক ঘণ্টা তাহাজ্জুদ পড়তে কোন সমস্যা নেই, এখন তো চাইলে দু' ঘণ্টাও পড়া যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায়ও প্রত্যেককে কমপক্ষে এক ঘণ্টা তাহাজ্জুদ পড়া উচিত। তবে, কোন অপারগতা থাকলে ভিন্ন কথা, যেমন কেউ অসুস্থ হলে, কেউ বৃদ্ধ হয়ে গেলে তার বিষয়টি আলাদা। বাকীদের তো এছাড়া চলবেই না। এর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিন। যিকরে এলাহীর প্রতিও অনেক মনোযোগ থাকা উচিত। এই চিন্তা করার পরিবর্তে যে, আজ আমরা অমুক ষ্টোরে যাবো। অমুক স্থানে তমুক ভাল জিনিস এসেছে। অথবা আমি অমুক পার্থিব কাজ করবো। কিংবা অমুক জায়গায় (গল্পের) আসর বসেছে, সেখানে গিয়ে বসবো। সময় নষ্ট করার পরিবর্তে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি মনোযোগ দিন। আর এটি বৃদ্ধি পেলেই আপনারা বিপ্লব সাধন করতে পারবেন। নিছক তারাণা পাঠ এবং জয়ধ্বনি দেওয়ায় কখনও পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি হয় না আর নিজেদের কাজকর্মেও বরকত হতে পারে না। কাজেই, প্রথম কথা হল, নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে উন্নত করুন। আর আপনারা মুরব্বীরা নিজেদের জামা'তের সদস্যদের জন্য আদর্শ স্থানীয় হওয়ার চেষ্টা করুন এবং একটি Role-model হোন। যাতে সবাই আপনাকে দেখে বলতে পারে যে, সত্যিকার অর্থেই মুরব্বী সাহেবের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সম্পর্ক আছে, আল্লাহ্র প্রতি মনোযোগ আছে, মানুষের প্রতি সহানুভূতিও আছে আর জামা'তের সদস্যদের সাথে ভালবাসা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারও করে। এসব বিষয় নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে পারলে তবেই আপনারা সাফল্য লাভ করবেন। নিজের অধীনস্ত লোকদের তরবিয়ত করতে পারলে আপনি জামা'তের মধ্যে এমন এমন কর্মী পেয়ে যাবেন, যারা আপনার সাহায্যকারী হবে, সহায়ক হবে আর এর ফলে আপনার কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: এই একই মোলাকাতে একজন মুরব্বী সাহেব নিবেদন করেন যে, হুযূর আপনি শুরুতেই তাহাজ্জুদ নামাযের উল্লেখ করেছেন। (এখানে) শীতকালে মানুষ সহজেই তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারে কিন্তু নিয়মিত এবং এসব দেশে গ্রীষ্মকালে এই অভ্যাস গড়ে তোলার উত্তম পদ্ধতি কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্র সাথে আপনার সম্পর্ক কতটা নিবিড় এবং আল্লাহ্কে কতটা ভালবাসেন, এটি তার ওপর নির্ভর করে। অন্যান্য কাজের জন্য সময় বের করেন কি-না? জার্মানিতে বসবাস করার কারণে সেখানে যদি রাত ১০টা বা ১০:৩০টায় এশার নামায হয় আর সকাল যদি হয় আড়াইটা, পৌনে তিনটা কিংবা তিনটায়। (এখানে যুক্তরাজ্যে বরং এর চেয়ে আরও আগে সেহরী হয় আর আপনাদের ওখানে আরও এক ঘণ্টা বিলম্বে সেহরী হয়। আধা- পৌনে ঘণ্টার পার্থক্য থাকে) তাহলে দু'ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা ঘুমান এরপর উঠে তাহাজ্জুদ পড়েন। এরপর ফজর পড়ে আবার এক-দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিন। আপনাকে নিজের রুটিন নিজেকেই বানাতে হবে। হৃদয়ে যদি কোন কাজ করার ব্যাকুলতা থাকে তাহলে সব পথই বের হয়ে আসে। জামেয়াতে যখন আপনাদের পরীক্ষা হতো, পড়াশোনার আগ্রহ থাকলে রাতে উঠে পড়তেন কি-না? অথবা কোন দুশ্চিন্তা হলে তাহাজ্জুদ পড়েন কি-না? এটি আসলে মন-মানসিকতার বিষয়। আপনি যদি আপনার চিন্তাভাবনাকে এভাবে প্রবাহিত করেন যে, আমাকে এই কাজ করতেই হবে- সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য করেন। কাজেই, মানুষ রাতে এক-দেড় ঘণ্টা ঘুমায় এরপর উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে। এরপর ফজরের নামাযের পর সময় পেলে ঘুমিয়ে নেয়। এভাবেই সময় বের করতে হয়। এরপর সারাদিনও তো আপনার কাছে সময় আছে। ঘুম পূর্ণ করার জন্য দুপুরবেলা এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিন। এটি এমন কোন সমস্যার বিষয় না। যে ইবাদত করার তা যৌবনেই করা সম্ভব। আপনারা তো যুবক, এখন আপনাদেরই সময়। এটিই সময়, এথেকে লাভবান হোন। আর ইবাদতের যতটুকু প্রাপ্য দেওয়া উচিত তা দেওয়ার চেষ্টা করুন।

(এরপর হুযূর একটি ফার্সি পঙক্তি বলেন, যার অর্থ)

যৌবনে তওবা করা নবীদের রীতি কেননা, বৃদ্ধ বয়সে হিংস্র নেকড়েও সাধু সেজে বসে।

প্রশ্ন: এই মোলাকাতেই আরেকজন মুরব্বী সাহেব নিবেদন করেন যে, দেখা যাচ্ছে তরুণ প্রজন্ম বেশিরভাগ সময় বাইরের সমাজের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। আমরা তাদেরকে জামা'তের নিকটে কীভাবে আনতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ঠিক আছে, এটি যুবক মুরব্বীদের কাজ। আপনারা এখানেই লালিতপালিত হয়েছেন। এখানেই বড় হয়েছেন। এখান থেকেই আপনারা গ্রাজুয়েশন করেছেন অথবা যে শিক্ষাই অর্জন করেছেন, মাধ্যমিক স্কুল থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, অথবা Abitur বা উচ্চমাধ্যমিক করেছেন কিংবা যা-ই করেছেন, তাই এই সমাজ সম্পর্কে আপনারা ভাল জানেন। আপনারাও এখানেই বসবাস করেন। সে অনুযায়ী দেখুন যে, কীভাবে তাদের তরবিয়ত করতে পারেন। আর এ কারণেই আমি বলি, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলুন। এজন্যই বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনও আছে।

অঙ্গসংগঠনগুলোর কাজ হল নিজেদের সদস্যদেরকে নিজেদের সাথে যুক্ত করা। আর যে ক'জন তরুণ মুরব্বী আছেন তাদের কাজ হল এদেরকে সাহায্য করা। এভাবে কাজ করলে ইনশাআল্লাহ্ (সব) ঠিক হয়ে যাবে। এটি চেষ্টার ওপরে নির্ভর করে। ঠিক আছে, পরিবেশই এমন। (এই) পরিবেশই তো আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ। এই পরিবেশেই আমাদেরকে তাদের অবস্থা অনুসারে চেষ্টা করতে হবে। নতুন কোন বিষয় তো নেই। নতুন কোন ফরমুলাও প্রণীত হবে না যে, আপনারা তা প্রয়োগ করবেন আর (রাতারাতি) সব মানুষের সংশোধন হয়ে যাবে এবং তারা (আল্লাহ্র) ওলী হয়ে যাবে। (এভাবে) কেউ কখনও ওলী হবে না। আর একদিনেই আপনারা আমাদের সকল টার্গেট অর্জন করতে পারবেন না। এর জন্য নিরন্তর চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রয়োজন, যাতে জামা'তের সদস্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে আর তাদের এই বোধদয় ঘটে যে, আমাদের আরও একটি দায়িত্ব আছে; আমরা যে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছি- তাও আমাদেরকে পালন করতে হবে। ধীরে ধীরে তাদেরকে সচেতন করতে থাকুন। আপনার অঙ্গসংগঠনের সদস্যরা জামা'তের সাথে অথবা বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সদস্যরা- খোদ্দামের সাথে, লাজনার সাথে এবং আনসারের সাথে তাদের যত বেশি সম্পর্ক গভীর হবে ততবেশি তাদের ওপর প্রভাব পড়বে। মুরব্বীরা তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষার জন্য যত বেশি সময় দিবেন ততবেশি প্রভাব পড়বে। এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার নাম আর এ কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এর জন্য কোন Hard and fast ফরমুলা প্রণয়ন করা যেতে পারে না। প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব অনুযায়ী এই ব্যবস্থা নিতে হবে। আর আপনাদের মতো যুবক মুরব্বীদের ওপর এই আস্থাই রাখা হয়েছে যে, আপনারা যারা ওখানে পড়াশোনা করেছেন, আপনারা বেশি ভালভাবে এই তরবিয়তের কাজ করতে পারবেন। যদি আপনাদের নিজেদের তরবিয়ত সঠিক হয়ে যায় আর যেমনটি আমি শুরুতেই বলেছিলাম, আল্লাহ্র সাথে যদি আপনাদের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে যায় তাহলে আপনারা দেখবেন, আপনারা বিপ্লব সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন, ইনশাআল্লাহ্। আর আমি

আশা করি, (আমাদের) তরুণ মুরব্বীরা যদি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে জেগে উঠে তাহলে এক বিপ্লব সাধিত হতে পারে। কেননা, আপনারা এখানকার সমাজে লালিতপালিত হয়েছেন। আগে তো পাকিস্তান থেকে কেউ আসতো, বাইরে থেকে কোন মুরব্বী আসতেন, তাদের সঠিকভাবে (পরিবেশ সম্পর্কে) জানা থাকতো না, ভাষার ক্ষেত্রে পুরোপুরি দক্ষতা থাকতো না। আপনাদের তো ভাষাগত দক্ষতাও আছে, ভালভাবে বুঝতে পারেন এবং ভালভাবে বলতেও পারেন। এখানকার সমাজে বসবাস করেছেন, সামাজিক রীতিনীতিও ভালভাবে জানেন। এছাড়া আপনারা নিজেরা নতুন নতুন পথ সন্ধান করুন যে, কীভাবে আমরা তাদের তরবিয়ত করবো। কীভাবে তাদেরকে জামা'তের সাথে Attach করতে হবে। কীভাবে আমাদেরকে নব-প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

প্রশ্ন:

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

অর্থাৎ, এবং যখন সে শাসন ক্ষমতায় আসে তখন সে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া বেড়ায়, অথচ আল্লাহ্ অশান্তিকে ভালবাসেন না।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৬)

বলতে ডিএনএ এবং আরএনএ এর মধ্যে রদবদল ঘটিয়ে মানুষের শারিরিক, মানসিক এবং বিশ্বাসগত পরিবর্তনের চেষ্টার অর্থ গ্রহণ করে এ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ারের দিক নির্দেশনা চেয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার ২০২১ সালের ২৪ শে নভেম্বর এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন: আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে কুরআ করীম কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য হিদায়াত তথা পথপ্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন,

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۫ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ (سورة الحجر:22)

(সূরা হিজর: ২২) অর্থাৎ আমরা বোঝা বহনকারী-সংযোজনকারী বায়ুরাশি প্রেরণ করি, অতঃপর মেঘমালা হইতে বারিধারা বর্ষণ করি, তৎপর আমরাই তোমাদিগকে উহা পান করাই; বস্তুতঃ তোমরা উহার সঞ্চয়কারী নহ।

(সূরা হিজর, আয়াত: ২২)

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আপনি এই আয়াতের যে অর্থ করেছেন তা সঠিক। এতে কোনও অসুবিধে নেই। ডিএনএ-র মধ্যে রদবদলের পরিণামে মানবতার ধ্বংস সংক্রান্ত বিষয়টি হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রা.)ও অনেক স্থানে বর্ণনা করেছেন। হুযুর (রাহে.) 'Revealation, rationality, knowledge and truth' গ্রন্থেও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে মানুষের সৃষ্টিতে এই ধরণের নেতিবাচক রদবদলের চেষ্টা সম্পর্কে পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহল এবং সরকারকে সতর্ক করেছেন।

অনুরূপভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রা.) নিজেদের সময় এই আয়াতের অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ব্যাখ্যাসমূহেও মানবদেহে এই ধরণের নেতিবাচক পরিবর্তনের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে বলেন- 'এমন মানুষরা যখন রাজত্ব পায়, অর্থাৎ তারা খোদা তা'লার সৃষ্টি শক্তিসমূহকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতাসীন হয়, তখন তারা প্রজা ও দেশের সেবা করে তাদের প্রশান্তি ও সুখ সমৃদ্ধি এনে দেওয়ার পরিবর্তে এমন সব পরিকল্পনা করতে শুরু করে যার পরিণামে এক জাতি অপর জাতির বিরুদ্ধে, এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এবং এক ধর্মের অনুসারীরা অপর ধর্মের অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করে এবং দেশে এক অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে তারা এমন পন্থা অবলম্বন করে যার ফলে দেশের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবস্থার পতন ঘটে এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যায়। 'হারস' এর আভিধানিক অর্থ ক্ষেত। কিন্তু এখানে হারস' শব্দের অর্থ রূপকভাবে ব্যপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে, দেশের সাংস্কৃতিক অবস্থা উন্নতির জন্য যতগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় সেই সব পদ্ধতি অবলম্বন করার পরিবর্তে এমন সব নিয়ম কানুন তৈরী করা হয় যার ফলে সভ্যতা ও অর্থনীতি ধ্বংস হয়, আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি না হয়। এভাবে তারা মানব প্রজন্মের উন্নতির পথে একটা অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং এমন আইন তৈরী করা হয় যার ফলে ভবিষ্যত প্রজন্ম শক্তিহীন ও দুর্বল হলে পড়ে এবং যে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে তারা উন্নতি করতে পারে তা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়।"

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৩-৪৫৪)

অনুরূপভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রাহে.) তাঁর খুতবায় (২৮ জুলাই, ও ১১ই আগস্ট ১৯৭২) সুরা বাকারার ২০৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় মানুষের জন্য খোদার পক্ষ থেকে দেওয়া বিভিন্ন শক্তি ও সামর্থের অনুচিত ব্যবহার ক্ষতিকর আখ্যায়িত করেন এবং মানবজাতিকে এর পরিণামে তৈরী হওয়া আল্লাহ্ তা'লার বিরাগ সম্পর্কে সতর্ক করেন। হুযুর (রহে.) খুতবাতে নাসের, ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। আপনি সেখান থেকে অধ্যায়ন করতে পারেন।

প্রশ্ন: ১৫ নভেম্বর, ২০২০ তারিখের এই Virtual সাক্ষাতানুষ্ঠানেই একজন মুরব্বী সাহেব হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, অন্যান্য জাতির মানুষ যারা জামা'তভুক্ত হচ্ছেন তারা জামা'তের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যে খুবই প্রভাবিত হয় কিন্তু জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং বিশেষভাবে আর্থিক কুরবানীতে তারা পুরোপুরি অংশ নিতে পারে না আর স্থানীয় জামা'তের সাথেও তাদের সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না, এ বিষয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে দিকনির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করছি।

এ বিষয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কথা হল, তাদের বিষয়টি জামা'তের ব্যবস্থাপনারও এতটা কঠিন বা জটিল করা উচিত নয়। এ কারণেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) শুরুতে একথাই বলেছিলেন, আর তাঁর পূর্বের খলীফাগণও একথাই বলেছেন আর আমিও বলছি যে, যারা নবাগত আহমদী, তারা যখন (জামা'তে) আসেন, আপনাদের সাথে যোগ দেন, প্রথমে তিন বছর সময়ের মধ্যে তাদেরকে বোঝান যে, জামা'তের সিস্টেম কি। তাদের সাথে এমন ব্যবহার করবেন না যেন তারা ওলীউল্লাহ্, অথবা সাহাবীদের সন্তান কিংবা জন্মগত আহমদী। বরং জন্মগত আহমদীরা তো (তুলনামূলকভাবে) কম জানে। নবাগত আহমদীরা ধর্মীয় জ্ঞানও আপনাদের চেয়ে বেশি রাখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, যারা ভালভাবে বুঝেশুনে জামা'তভুক্ত হয় তারা নামাযের প্রতিও বেশি মনোযোগী থাকে। তারা এস্তেগফারও করে। তারা তাহাজ্জুদও পড়ে আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক বোঝার-অনুধাবনেরও চেষ্টা করে। যাহোক, আমাদের কাজ এটি নয় যে, যিনি জামা'তভুক্ত হন প্রথম দিন থেকেই তাকে (সব বিষয়ে বাধ্য) করা। এ কারণেই (প্রথম) তিন বছর তাদের ওপর চাঁদার ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা হয় না। (প্রথম) তিন বছর সময়কাল তাদের জন্য প্রশিক্ষণের, যাতে এ সময়ের মধ্যে তাদের তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণ হয়ে যায়। তাদেরকে বলুন, এই হল জামা'তের ব্যবস্থাপনা, কিন্তু তুমি যেহেতু এখনও নবাগত, তুমি প্রথমে এটি ভালভাবে দেখো, অনুধাবন করো- এরপর আর্থিক কুরবানীর বিষয়টি দেখো যে, আল্লাহ্ তা'লা কেন আর্থিক কুরবানীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন? তুমি চাইলে তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী ওয়াকফে জাদীদ এবং তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা দিতে পারো। চাইলে বছরে এক বা দুই ইউরো দাও, যাতে তুমি উপলব্ধি করতে পারো যে, জামা'তের সাথে তোমার কোন Attachment আছে। একইভাবে নামাযের ব্যাপারে তাদেরকে বলুন যে, নামায (পড়া) শেখো। অমুসলমান থেকে মানুষ যখন মুসলমান হয়, আহমদী মুসলমান হয় তখন তাকে সূরা ফাতিহা শিখাতে আরম্ভ করুন। যখন সে সূরা ফাতিহা শিখে ফেলবে, মুখস্থ করে ফেলবে। এরপর যখন সে নামায পড়বে তখন তাকে নামাযের আবশ্যিক বিষয়গুলো বলুন যে, দেখো! আল্লাহ্ তা'লা নামায ফরয করেছেন। প্রথম মৌলিক বিষয় হল, নামায! তাই না? কাজেই আল্লাহ্ তা'লা যখন নামায ফরয করেছেন তখন মহানবী (সা.) বলেছেন, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক। নামাযের মূল বিষয় হল সূরা ফাতিহা আর সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না, তাই তাকে প্রথমে সূরা ফাতিহা মুখস্থ করান। এরপর তাকে বলুন, ঠিক আছে এবার তুমি অনুবাদ মুখস্থ করো। অথবা তাকে বলুন, তুমি যদি অনুবাদ শিখে নাও তাহলে ইমাম সাহেব যখন নামাযে উচ্চৈঃস্বরে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন তখন যেন তুমি বুঝতে পারো যে, ইমাম কি পড়ছেন। এরপর তার মাঝে আপনা আপনি সূরা ফাতিহা মুখস্থ করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এখানে অনেক ইংরেজ আহমদী হয়েছেন, আমি তাদেরকে দেখেছি, তারা খুবই আগ্রহের সাথে এটি মুখস্থ করেছে। অথবা অন্য যে দেশেই আমার সাথে যারা সাক্ষাৎ করে আমি যখন তাদেরকে বলি, তারা সূরা ফাতিহা মুখস্থ করে আর আল্লাহ্‌র কৃপায় খুব ভাল ভাবে মুখস্থ করে আর (এর মর্ম) অনুধাবনও করে। কাজেই, তিন বছর সময়কাল তাদের জন্য একটি ট্রেনিং পিরিয়ড বা প্রশিক্ষণ কাল। তিন বছরের মধ্যে যদি তাদের এই প্রশিক্ষণ হয়ে যায় তখন জামা'তের মূল ব্যবস্থাপনার সাথে Integrate হওয়া তাদের জন্য কঠিন হবে না।

প্রথম দিন থেকেই যদি তাদের কাছে প্রত্যাশা রাখেন যে, তারা ওলী আল্লাহ্ হয়ে যাবে তাহলে সেটি সম্ভব নয়। (এই প্রত্যাশা রাখা) আপনাদের অপরাধ। তিন বছর সময়কাল রাখাই হয়েছে এ জন্য যে,এ সময় তাদের কাছ থেকে চাঁদা নিবেন না আর তাদের ওপর বেশি জোর খাটানোও যাবে না। শুধু তাদের তরবিয়ত করতে হবে যে, জামা'তের ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? আর তাদেরকে Harshly-ও তরবিয়ত করা যাবে না। বরং ভালবাসা ও স্নেহের সাথে বোঝাতে হবে যে, নামায কাকে বলে? নামায ফরয কেন? (তাই) নামায পড়ো। তুমি চাইলে একবেলা, দুবেলা, তিনবেলা কিংবা চারবেলা নামায পড়তে পারো কিন্তু যিনি মু'মিন তার জন্য পাঁচ বেলা নামায পড়া আবশ্যক। আর এর কারণ কি? নামায পড়ার হিকমত বা প্রজ্ঞা কি? জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য শুনে যারা প্রভাবিত হয় তাদেরকে নামাযের প্রজ্ঞা কী তা বোঝান। যদি তার মধ্যে এতটুকু বিবেকবুদ্ধি থাকে যাতে সে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যের মর্ম বুঝতে পারে। এর দর্শন কী- তা বুঝতে পারে। এর গভীরতা অনুধবান করতে পারে।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 13 June, 2024 Issue No.24

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

'আমার তিন মেয়ে, যদি পুত্র সন্তান লাভ হয় তবেই আহমদী হব। ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ারের কাছে দোয়ার পত্র লেখেন। পরের বছর পুনরায় সাত মাসের অন্তঃসত্তা হয়ে তিনি জলসায় আসেন। সাক্ষাতের সময় তিনি শিশুর নামকরণের আবেদন করলে হুযুর আনোয়ার (আই.) কেবল পুত্র সন্তানের নাম 'জাহিদ' প্রস্তাব করেন।

জলসা থেকে ফিরে গিয়ে ভদ্রমহিলা মুবাল্লিগ সাহেবকে বলেন, ডাক্তার বলেছে আমার গর্ভে কন্যা সন্তান আছে। তাই হুযুরের কাছে পুনরায় কন্যাসন্তানের নাম চেয়ে পাঠান।

একথা শুনে মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, আপনি তো বলেছিলেন পুত্র সন্তান হলে তবে্ই আহমদী হবেন। আর হুযুর আনোয়ারও কেবল পুত্রসন্তানের নাম প্রস্তাব করেছেন। তাই ইনশাআল্লাহ্ পুত্র-সন্তানের জন্মই হবে দেখবেন। ডাক্তারের কথা ভুলও হতে পারে। একথা শুনে সেই মহিলা বলেন, আমি তো ইতিপূর্বেই আহমদী হয়ে গেছি। এখন আমার আর কোন শর্ত নেই।

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার দেখা গেল আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পুত্রসন্তান দান করেছেন। তিনি জলসায় ছেলেকে সঙ্গে করে এনেছিলেন আর লোকদের বলছিলেন, 'এটি যুগ খলীফার দোয়ার গ্রহণীয়তার স্পষ্ট নিদর্শন।

মারিয়ো বিকোভ নামে এক আইনজীবি গত ৭ বছর থেকে এই জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। তিনি বলেন- 'আজ ইসলামের প্রকৃত রূপ কেবল খলীফাই বর্ণনা করেন। অন্যান্য মুসলমানেরা ইসলামের সুনামহানি করছে। হুযুর আনোয়ার ইসলামের যে ভাবমূর্তি তুলে ধরছেন সেটিই প্রকৃত ইসলাম। এদিকে জগতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত।

অতিথিদলের এক মহিলা বলেন- 'খলীফাতুল মসীহর কথাগুলি কেবল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে সুসজ্জিত করে তোলার নিশ্চয়তা দেয় না, বরং তা গোষ্ঠী ও সমাজজীবনকেও সুন্দর করে গড়ে তোলার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

সাফাত আরিফুফ সাহেব নামে এক নবাগত আহমদী নিজের আবেগ অনুভূতির কথা জানিয়ে বর্ণনা করে একটি কবিতা রচনা করেছেন যার সারমর্ম হল, 'হে মহম্মদের দাস! আমার প্রিয় রব তোমাকে মনোনীত করেছে। যে এই যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করতে চায়, সে এই দাসের চেহারা দেখে নিক। হে আমার প্রিয় হুযুর! আমি আপনার চোখে ক্ষুদ্র একবিন্দু অশ্রু দেখেছি, যা আমার হৃদয়ের শুষ্ক ভূমিকে শস্যশ্যামলা বানিয়ে দিয়েছে। তাঁর অশ্রু দিয়ে জার্মানীতে আমি জান্নাত দেখেছি। আমার প্রিয় হুযুর! আপনি এমন চমৎকার করেছেন যে আমার মত অসহায় মানুষকে বুলগেরিয়া থেকে খুঁজে বের করেছেন। আমি আপনার কৃপার জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি।

হাঙ্গেরী থেকে আসা অতিথিদলের সঙ্গে সাক্ষাত।

হাঙ্গেরী থেকে ২১ জনের একটি দল জলসায় এসেছিল। হুযুর আনোয়ার তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

* মেযিইয়াই লাসজ্লো সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পুলিশ বিভাগে বিভিন্ন পদে আসীন থেকেছেন। বর্তমানে হাঙ্গেরী এক বিপ্লবী প্রধানমন্ত্রীর নামে একটি তহবিল গঠন করেছেন, যার মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী এই ভদ্রলোক নিজের ভাবাবেগ বর্ণনা করে বলেন-

ছোট বড় প্রত্যেকে সালাম করছিল, পরস্পরের সঙ্গে ভালবাসা আদান প্রদান করছিল। আমি তাদের ভাষা বুঝতে পারছিলা না ঠিকই , কিন্তু তাদের চেহারার হাবভাব দেখে বুঝেছি, তারা স্নেহ-ভালবাসার প্রসার করছে। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য, আমি গোটা পৃথিবীটাই দেখেছি, কিন্তু কোথাও এমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখি নি। জলসার এই বিচিত্র প্রভাব আমার স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমি অবশ্যই আমার বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদেরকে জামাত আহমদীয়ার এই জলসার বিষয়ে জানাব।

খলীফাতুল মসীহ্র সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি বলেন, 'যতক্ষণ আমি সেখানে বসেছিলাম, আমি অনুভব করছিলাম যেন খলীফাতুল মসীহ্র সত্তা থেকে আলোক রশ্মি বিকিরিত হয়ে আমার মধ্যে প্রবেশ করছে। জলসার সময়ও আমি এমনটাই অনুভব করেছি, খলীফা যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল যেন তাঁর চোখ থেকে আলো বেরিয়ে এসে শ্রোতাদের সকলের উপর পড়ছে আর শ্রোতারা তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে।

তিনি বলেন,এমন শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে এতবড় জমায়েতের আয়োজন করাই এক অবর্ণনীয় বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

গ্যাবর তামাস সাহেবও জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। গত বছরও তিনি এসেছিলেন। এবছর নিজেই ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছেন যে তিনি এবারও জলসায় অংশগ্রহণ করতে পারেন কি না। সাক্ষাতের সময় হুযুর আনোয়ার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি তো গত বছরও এসেছিলেন?' এতে তিনি খুবই আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'হুযুর লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করেন, তবুও কিভাবে মনে রাখেন?' তিনি নিজের আবেগ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে বলেন, আমি আপনাদের জলসায় অংশ করে ঈমানের দিক থেকে সতেজতা অনুভব করছি। আপনারা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে পৃথিবীতে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। হুযুর আনোয়ার কালকে ইংরেজিতে যে ভাষণটি দিয়েছেন, তা একদিকে যেমন মানবতাকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে, তেমনি অপরদিকে মানবীয় মূল্যবোধকেও প্রতিষ্ঠিত রাখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন-আমরা সারা পৃথিবীতে মানবীয় মূল্যবোধপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এটি হলে তবেই পৃথিবীতে শান্তি, সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই পৃথিবী শান্তিনীড়ে পরিণত হবে।

একজন নবাগত আহমদী এক মাস পূর্বেই বয়আত করেছেন। তিনিও জলসায় অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন। তিনি একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন, সেই সঙ্গে তিনি জৈব রসায়ন নিয়ে পি.এইচ.ডি করছেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে বরকত দিন আর আপনার সকল পুণ্যময় আকাঙ্খাগুলি পূর্ণ করুন।

হাঙ্গেরীর অতিথি দলে এক আফগান অ-আহমদী ছিলেন, যার নাম মহম্মদ আজমল সাহেব। কিছুকাল পূর্বেই জামাতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। জলসায় অংশগ্রহণের পর তিনি বলেন, আপনাদের জামাতে আমি অমুসলিম সুলভ কোন বিষয় দেখি নি। এটি খুব সুন্দর ইসলাম যা আপনারা উপস্থাপন করছেন। পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশ আপনাদের উপর যে অত্যাচার করে তা সম্পূর্ণ অবৈধ। চতুর্দিকে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ এবং আঁ হযরত (সা.)-এর উপর দরুদ প্রেরণ করা হচ্ছে। প্রকৃত ইসলাম তো আপনাদের কাছেই আছে।

গাবুর পিটার সাহেব একজন ইহুদী, যিনি শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। জলসায় অংশগ্রহণ করার পর তিনি বলেন, আমি এখানে জলসায় অংশগ্রহণ করে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা শুনেছি। আমার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলির মধ্যে ছিল জলসার এই দিনগুলি। জামাতে আহমদীয়া প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনা করে এবং সকলের সঙ্গে মিলে কাজ করতে চাই।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের সকলের মধ্যে যে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলি আছে, সেগুলির উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত এবং সকলে মিলে মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করা উচিত এবং একে অপরকে সম্মান করা উচিত।

তাঁর সম্পর্কে হাঙ্গেরীর মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করার পূর্বে যখন তাঁকে ইসলাম এবং ইহুদী ধর্ম সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা হত, অনেক সময় তিনি বক্রতারও আশ্রয় নিতেন। কিন্তু হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি বলেন, 'আপনারা 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে- এই শিক্ষার উপর বিশ্বাসই করেন না, বরং আমি নিজেই দেখলাম যে, আপনারা এই নীতিবাক্যকে অনুশীলনও করেন। হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি বিতর্ক করা ছেড়ে দিয়েছেন আর জলসায় আমন্ত্রিত করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, হাঙ্গেরীতে জামাতের যদি কোন সহায়তার দরকার হয়, আমাকে অবশ্যই বলবেন।

মোরিতানিয়ার বাসিন্দা একজন পুরোনো আহমদীও জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন, যিনি বর্তমানে হাঙ্গেরীতে থাকেন। তিনি বলেন, হাঙ্গেরীতে তিনি একজন ছাত্র হিসেবে এসেছিলেন আর সেখানেই পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। আমার জন্য সব থেকে বেশি প্রশান্তিদায়ক বিষয় হল, আমি জামাতে আহমদীয়ার অংশ। আমার সৌভাগ্য যে আমি একজন আহমদী এবং সুন্দরতম স্থানে বসবাস করছি। আর কতই না সৌভাগ্যের বিষয় যে আজ এখানে আমি হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করছি, তাঁর সঙ্গে কথা বলছি।

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir